بنغالي
BENGALI

কুরআন ও সহীহ হাদীছের মানদণ্ডে

الصوفية
في ميزان الكتاب والسنة

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجبيل
JUBAIL DA'WAH & GUIDANCE CENTER
هاتف: ٣٦٢٥٥٠٠ ٠٣ فاكس: ٣٦٢٦٦٠٠ ٠٣ ص.ب. ١٥٨٠ الرمز البريدي: ٣١٩٥١
الموقع الرسمي: jubaildawah.org البريد الإلكتروني: info@jubaildawah.org

কুরআন ও সহীহ হাদীসের মানদণ্ডে

সূফীবাদ

সংকলনেঃ

আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী

লিসান্সঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, এম,এম, ফাস্ট ক্লাশ

সূচীপত্র الفهارس

ভূমিকা

কাশফের একটি উদাহরণঃ
২) নবী ও মৃ তঅলী-আওলীয়াগণঃ
৩) খিযির আলাইহিস সালামঃ
৪) ইলহামঃ
৫) ফিরাসাতঃ
৬) হাওয়াতেফঃ
৭) সূফীদের মিরাজঃ
৮) স্বপ্নের মাধ্যমে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তিঃ
৯) মৃ তঅলীদেদের সাথে সূফীদের যোগাযোগঃ
১০) শয়তানঃ
উপসংহারঃ

ভূমিকা

ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানগণ নিঃশর্তভাবে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করে চলতেন। তারা নির্দিষ্ট কোন মাজহাব, তরীকা বা মতবাদের দিকে নিজেদেরকে নিসবত (সম্পৃক্ত) করতেন না। সকলেই মুসলিম বা মুমিন হিসেবে পরিচয় দিতেন। তবে বদরের যুদ্ধ যেহেতু ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ছিল এবং তাতে অংশগ্রহণ করা বিশেষ একটি ফজীলতের কাজ ছিল, তাই যারা বদরের যুদ্ধে শরীক হয়েছেন তাদেরকে বদরী সাহাবী, যারা বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে আসহাবে বাইআত এবং দ্বীনি ইলম শিক্ষায় সর্বক্ষণ আত্মনিয়োগকারী সুফফাবাসী কতিপয় গরীব সাহাবীকে আসহাবে সুফফা বলা হত। কিন্তু পরবর্তীর্তে মুসলমানগণ রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য কারণে বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। মুসলমানদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করে শিয়া, খারেজী, মুতাজেলা, কদরীয়া, আশায়েরা, জাহমেয়ী এবং আরও অসংখ্য বাতিল ফির্কা ও মতবাদ। এরই ধারাবাহিকতায় সুফীবাদও একটি ধর্মীয় মতবাদ হিসেবে মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে।

সুফী মতবাদ কখন থেকে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে, তার সঠিক সময় নিধারণ করা কঠিন। তবে সঠিক কথা হচ্ছে এ মতবাদটি হিজরী তৃতীয় শতকে ইসলামী জগতে ছড়িয়ে পড়ে। তখন শুধু কতিপয় লোকের ব্যক্তিগত প্রবণতা, আচরণ ও আগ্রহের মধ্যেই এটি সীমিত ছিল। কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক দুনিয়ার ভোগবিলাস ও আরাম-আয়েশ পরিহার করে ইবাদতে মশগুল হওয়ার আহবান জানানোর মাধ্যমে এ পথের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ব্যক্তিগতভাবে গড়ে উঠা আচরণগুলো উন্নতি লাভ করে একটি মতবাদে পরিণত হয় এবং সূফীবাদের নামে বিভিন্ন তরীকার আবির্ভাব ঘটে। এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকা, আত্মাকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পরিশুদ্ধ করা, আল্লাহর ভয় দিয়ে অন্তর পরিপূর্ণ রাখা, তাওবা-ইস্তেগফার ও যিকির-আযকারের মাধ্যমে কলব পরিস্কার রাখার প্রতি সূফীরা আহবান জানায়। নিঃসন্দেহে এই কাজগুলোর প্রতি ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এগুলো ইসলামের মৌলিক বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত। তবে পার্থক্য হচ্ছে সূফীরা আত্মশুদ্ধি অর্জন ও আত্মার উন্নতির মাধ্যমে আল্লাহর সান্যিধ্যে পৌঁছার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পথ বাদ দিয়ে কাশফ এবং মুশাহাদার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কুরআন ও সুন্নাহর পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বণ করার কারণে সূফীবাদের মধ্যে ইউনানী, পারস্য, বৌদ্ধ এবং অন্যান্য দর্শন প্রবেশ করে। পরিণামে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সূফীবাদের সূচনা হয় কালের পরিক্রমায় তা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি অগ্রহণযোগ্য মতবাদে পরিণত হয়। তাতে প্রবেশ করে ইসলাম ধ্বংসকারী বিভিন্ন শির্ক ও বিদআত। পরিস্থিতি যখন এরূপ ভয়াবহ আকার ধারণ করল, তখন উম্মাতের আলেমগণ লেখনী ও ভাষন-বক্তৃতার মাধ্যমে এই মতবাদের কঠোর প্রতিবাদ করেছেন এবং মুসলমানদেরকে সুফী ও তাদের মতবাদ থেকে দূরে থাকার আহবান জানিয়েছেন। আল্লামা ইবনে তাইমীয়ার ভূমিকা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে ভারতীয় উপমহাদেশেও সূফীবাদের অনুপ্রবেশ ঘটে। আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশেও রয়েছে অসংখ্য সুফী তরীকা ও মতবাদ। মুসলমানদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আমি এ প্রবন্ধে প্রচলিত সূফীবাদের কিছু আকীদা-বিশ্বাস, আমল ও মূলনীতি বর্ণনা করবো। যাতে একজন মুসলিম এ সমপর্কে সচেতন হতে পারেন এবং যারা সুফী দর্শনে বিশ্বাসী তারাও যেন সূফীবাদের সমস্যাগুলো জানতে পারেন এবং প্রচলিত সূফীবাদের বিশ্বাস, কথা ও কাজগুলো কুরআন ও হাদীছের কতটুকু কাছে বা তা থেকে কতটুকু দূরে তাও অনুমান করতে পারেন। মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে সঠিক কথা শুনা ও তা মানার তাওফীক দেন। আমীন।

আব্দুল্লাহ্ শাহেদ আল-মাদানী
ashahed1975@gmail.com

সূফীবাদের পরিভাষায় সুফী কাকে বলে?

১. সুফী শব্দটি صوف বা (পশম) থেকে উদগত হয়েছে। কারণ, সূফীরা সহজ সাধারণ জীবন যাপনের অংশ হিসাবে পশমী কাপড় পরিধান করতেন।

২. মোল্লা জামী বলেন, শব্দটি) صفاء পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা থেকে নির্গত হয়েছে। কেননা তারা পূতপবিত্র ও স্বচ্ছ জীবন যাপন করতেন। সুফীর সংজ্ঞায় বর্ণিত এই কথাটি ঠিক নয়। কারণ সূফীরা নিজেদেরকে صوفي বলে উল্লেখ করেন। صفاء শব্দ থেকে সুফীর উৎপত্তি হয়ে থাকলে তারা নিজেদেরকে صفائي সাফায়ী বলতেন। অথচ এই মতবাদে বিশ্বাসী কোন লোক নিজেকে সাফায়ী বলেন না। বরং সুফী বলেন। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, সুফী হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি, যিনি পশমী ও মোটা কাপড় পরিধান করেন এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাস পরিহার করে সরল সোজা ও সাদামাটা জীবন যাপন করেন।

সুফীবাদের বিভিন্ন তরীকার বিবরণ

সুফীদের রয়েছে বিভিন্ন তরীকা। স্থান ও কাল অনুযায়ী অসংখ্য সুফী তরীকা আত্ম প্রকাশ করার কারণে এর সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে অসংখ্য সুফী করীকা আত্ম প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে নিম্নের কয়েকটি তরীকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায়ই সুফী তরীকার পীর ও মুরীদদের মুখে এ সমস্ত তরীকার নাম উচ্চারণ করতে শুনা যায়। এ সমস্ত তরীকা হচ্ছেঃ

১) কাদেরীয়া তরীকাঃ আব্দুল কাদের জিলানীকে (মৃ ত৫৬১ হিঃ) এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সুফীরা দাবী করে থাকেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ও তার জীবনী অধ্যায়ন করলে জানা যায় যে, তিনি কোন তরীকা প্রতিষ্ঠা করে যান নি। তার নামে যে সমস্ত কারামত বর্ণনা করা হয় তা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

২) নকশবন্দীয়া তরীকাঃ মুহাম্মাদ বাহাউদ্দীন নকশবন্দীকে (মৃ ত৭৯১ হিঃ) এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

৩) চিশতিয়া তরীকাঃ খাজা মঈন উদ্দীন চিশতীকে (মৃ ত৬২০ হিঃ) এ তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। ভারতের আজমীরে তার মাজার রয়েছে। হিন্দু-মুসলিম সকলেই এ মাজার যিরারত করে থাকে।

৪) মুজাদ্দেদীয়া তরীকাঃ মুজাদ্দে আলফে ছানীকে (মৃ ত১০৩৪ হিঃ) এই তরীকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দাবী করা হয়।

৫) সোহরাওয়ার্দী তরীকাঃ শিহাব উদ্দীন উমার সোহরাওয়ার্দীর (মৃ ত ৬৩২ হিঃ) নামে এই তরীকাটির নিসবত করা হয়। এই পাঁচটি তরীকার নামই আমাদের দেশের সুফীদের মুখে ব্যাপকভাবে উচ্চারণ করতে শুনা যায়।

সুফীবাদের স্তর পরিক্রমাঃ

ক) শরীয়তঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থার যাবতীয় বিধানকে শরীয়ত বলা হয়। সর্বপ্রথম শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হতে হয়। শরীয়তের যাবতীয় বিধানের মধ্য দিয়ে সুফী তার প্রবৃ ত্তিকেনিয়ন্ত্রিত করে প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর অনুগত করেন। শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ ব্যতীত কেউ সুফী হতে পারবে না। সুফীরা এ কথাটি জোর দিয়ে বললেও তাদের আচার-আচরণ এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ অনেক সুফীকেই দেখা যায় তারা মারেফতের দোহাই দিয়ে শরীয়তের বিধান মানতে আদৌ প্রস্তুত নন।

খ) তরীকতঃ সুফীদের পরিভাষায় তরীকত হচ্ছে; শরীয়তের যাবতীয় বিধান অনুশীলনের পর তাকে আধ্যাত্মিক গুরুর শরণাপন্ন হতে হবে। এ পর্যায়ে তাকে বিনা প্রশ্নে গুরুর আনুগত্য করতে হবে।

গ) মারেফতঃ সুফীদের পরিভাষায় মারেফত হচ্ছে, এমন এক স্তর যার মধ্যে বান্দাহ উপনীত হলে সৃ ষ্টি রহস্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এ স্তরে পৌঁছতে পারলে তার অন্তর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তখন তিনি সকল বস্তুর আসল তত্ত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেন। মানব জীবন ও সৃ ষ্টিজীবনের গুপ্ত রহস্য তার নিকট সপষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে।

ঘ) হাকিকতঃ সুফীদের ধারণায় তাদের কেউ এ স্তরে পৌঁছতে পারলে আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রেমের স্বাদ ও পরমাত্মার সাথে তার যোগাযোগ হয়। এটা হচ্ছে সুফী সাধনার চুড়ান্ত স্তর। এ স্তরে উন্নীত হলে সুফী ধ্যানের মাধ্যমে নিজস্ব অস্তিত্ব আল্লাহর নিকট বিলীন করে দেন।
উপরোক্ত নিয়মে ভক্তদের নামকরণ করা ও স্তরভেদ করা একটি বানোয়াট পদ্ধতি। ইসলামের প্রথম যুগে এগুলোর কোন অস্থিত্ব ছিল না। পরবর্তীতে সুফীরা এগুলো নিজের খেয়াল খুশী মত তৈরী করেছে।

প্রচলিত সুফীবাদের কতিপয় বিভ্রান্তিঃ
সুফীবাদের যেহেতু বিভিন্ন তরীকা রয়েছে তাই তরীকা ও মাশায়েখ অনুযায়ী তাদের রয়েছে বিভিন্ন আকীদা ও কার্যক্রম। নিম্নে আমরা অতি সংক্ষেপে তাদের কতিপয় আকীদা ও বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করবো। তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, সুফীবাদের সকল সমর্থকের ভিতরেই যে নিম্নের ভুল-ভ্রান্তিগুলো রয়েছে তা বলা কঠিন।
১ الحلول হুলুল এবং وحدة الوجود ওয়াহদাতুল উজুদঃ
সুফীদের যে সমস্ত ইসলাম বিরোধী আকীদাহ রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্টি আকীদাহ (বিশ্বাস) হচ্ছে ، عقيدة الحلول والاتحاد আকীদাতুল হুলুল ওয়াল ইত্তেহাদ।
সুফীদের কতিপয় লোক হুলুল তথা সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর অবতরণে বিশ্বাস করে। হুলুল-এর সংজ্ঞায় আলেমগণ বলেনঃ
أما الحلول فمعناه (عند الصوفية) أن الله يحل في بعض مخلوقاته ويتحد معهاكاعتقاد النصارى حلوله في المسيح عيسى ابن مريم واعتقاد بعض الناس حلوله في الحلاج وفي بعض مشايخ الصوفية
হুলুল এর তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিপয় সৃষ্টির মধ্যে অবতরণ করেন এবং তার সাথে মিশে একাকার হয়ে যান। যেমন খৃষ্টানদের ধারণা যে, ঈসা ইবনে মারইয়ামের মাধ্যমে ¯^qs আল্লাহ অবতরণ করেছিলেন। সুফীদের কতিপয় লোকের বিশ্বাস হচ্ছে প্রখ্যাত সুফী সাধক মানসুর হাল্লাজ এবং অন্যান্য কতিপয় সুফী সাধকের মধ্যে আল্লাহ অবতরণ করেছেন। নাউযুবিল্লাহ। এটি যে একটি কুফরী বিশ্বাস তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
তারা আল্লাহ্‌কে যথার্থরূপে বুঝে নি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। (সূরা যুমারঃ ৬)
মানসুর হাল্লাজকে তার যুগের খলীফা চারটি কারণে হত্যা করেনঃ
১ أنا الحق (আনাল হক্ক বলার কারণে তথা রুবুবীয়াত ও উলুহীয়াতের দাবী করার কারণে।
২) ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ যাদু চর্চা করার কারণে।
৩) শরীয়তের ফরজ বিষয়সমূহ অস্বীকার করার কারণে। মানসুর হাল্লাজ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি হজ্জ করতে চাইলে সে যদি তার বাড়িতে একটি ঘর নির্মাণ করে হজ্জের মৌসুমে তার তাওয়াফ করে তাতেই যথেষ্ট হবে।
৪) কারামেতা তথা বাতেনী সমপ্রদায়ের প্রতি আহবান জানানোর কারণে। কারামেতা সমপ্রদায় প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বললেও তারা ছিল মূলতঃ গোপনে অগ্নিপূজক। এই সমপ্রদায় ৩১৯ হিজরী সালে কাবা ঘরে হামলা চালিয়ে হাজীদেরকে অকাতরে হত্যা করেছিল, যমযম কূপ ধ্বংস করে দিয়েছিল এবং হাজরে আসওয়াদ চুরি করে নিয়ে ছিল। ২০ বছর পর্যন্ত মুসলিমগণ হাজরে আসওয়াদ বিহীন কাবা ঘরের তাওয়াফ করেছে।
অপর পক্ষে সুফীদের আরেক দল ওয়াহদাতুল উজুদে বিশ্বাসী। ওয়াহ্‌দাতুল উজুদের এর তাৎপর্য হচ্ছে
وأما الاتحاد فمعناه (عند الصوفية) أن عين المخلوقات هو عين الله تعالى

সৃষ্টিএবং স্রষ্টা একই জিনিষ। অর্থাৎ সৃষ্টিজীবএবং আল্লাহ তাআলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, উভয়ই এক ও অভিন্ন। ইবনে আরাবী এ মতেরই সমর্থক ছিল। তার মতে পৃথিবীতেযা আছে সবই মাবুদ। অর্থাৎ সবই সৃষ্টিএবং সবই মাবুদ। এ অর্থে কুকুর, শুকর, বানর এবং অন্যান্য নাপাক সৃষ্টিও মাবুদ হতে কোন বাঁধা নেই। সুতরাং তার মতে যারা মূতি পূজা করে তারা আল্লাহরই এবাদত করে। (নাউযুবিল্লাহ)

ইবনে আরাবীর মতেঃ

إن العارف المكمل هو من يرى عبادة الله والأوثان شيء واحد

অর্থাৎ পরিপূর্ণ মারেফত হাসিলকারীর দৃষ্টিতে আল্লাহর এবাদত ও মূর্তিপূজা একই জিনিস। ইবনে আরাবী তার কবিতায় বলেনঃ

العبد رب والرب عبد * يا ليت شعري من المكلف

إن قلت عبد فذلك حق * أو قلت رب فأنى يكلف

বান্দাই প্রভু আর প্রভুই বান্দা। আফসোস যদি আমি জানতাম, শরীয়তের বিধান কার উপর প্রয়োগ হবে। যদি বলি আমি তাঁর বান্দা তাহলে তো ঠিকই। আর যদি বলি আমিই রব তাহলে শরীয়ত মানার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? উপরোক্ত কারণ এবং আরও অসংখ্য কারণে আলেমগণ ইবনে আরাবীকে গোমরাহ বলেছেন। সৃষ্টিএবং স্রষ্টা কখনই এক হতে পারে না। আল্লাহ ব্যতীত বাকী সকল বস্তু হচ্ছে সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি স্রষ্টা। কিরূপে আল্লাহ্‌র পুত্র হতে পারে, অথচ তার কোন সঙ্গিনী নেই? তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টিকরেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। (সূরা আনআমঃ ১০১) কুরআন ও সহীহ হাদীছে দিবালোকের মত পরিস্কার করে বলা আছে যে, মহান আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত, তার গুণাগুণ সৃষ্টিজীবের গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের বিরাট সংখ্যক মুসলিম ওয়াহ্‌দাতুল উজুদে বিশ্বাসী। তাবলীগী নিসাব ফাযায়েলে আমাল বইয়ে গাঙ্গুহী তার মোরশেদ হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কীর খেদমতে লিখিত এক চিঠিতে বলেনঃ -------অধিক লেখা বে-আদবী মনে করিতেছি। হে আল্লাহ! ক্ষমা কর, হজরতের আদেশেই এই সব লিখিলাম, মিথ্যাবাদী, কিছুই নই, শুধু তোমরাই ছায়া, আমি কিছুই নই, আমি যাহা কিছু সব তুমিই তুমি। (দেখুনঃ ফাযায়ে আমাল, দ্বিতীয় খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা) এই কথাটি যে একটি কুফরী কথা তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসুন আমরা এই বাক্যটির ব্যাপারে আরব বিশ্বের আলেমদের মূল্যায়ন জানতে চেষ্টা করি। তাদের কাছে উপরের বাক্যটি এভাবে অনুবাদ করে পেশ করা হয়েছিল।

إن إطالة الكلام سوء الأدب ، اللهم اغفر ، فإنما كتبت كل هذه بأمر الشيخ أنا كذاب أنا لا شيء إنما أنا ظلك ، أنا لا شيئ، وما أنا، هو أنت

অনুবাদটি শুনে তারা বলেছেনঃ شرك محض অর্থাৎ এটি শির্ক ছাড়া অন্য কিছু নয়।

উপরোক্ত ভ্রান্ত বিশ্বাসের খন্ডনঃ

ইসলামের প্রধান দুটি মূলনীতি এবং ইসলামী শরীয়তের দুটি মূল উৎস কুরআন ও সহীহ হাদীছে সুস্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর পরিচয়, গুণাগুণ এবং তাঁর অবস্থান উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে মহান রাব্বুল আলামীন নিজেই নিজের পরিচয় তুলে ধরেছন এবং তাঁর রাসূলও অনেক সহীহ হাদীছে তাঁর পরিচয় বর্ণনা করেছেন। এ থেকে জানা যায় যে আল্লাহ তাআলা আকাশে এবং আরশে আযীমের উপর সমুন্নত। বেশ কিছু আয়াত ও হাদীছে সরাসরি আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। আবার অনেক আয়াত ও হাদীছের মাধ্যমে আকাশের উপরে হওয়ার কথা জানা যায়। মূলতঃ উভয়ের মাঝে কোন দ্বন্ধ নেই। কেননা আল্লাহর আরশ হচ্ছে সাত আকাশের উপর।

আল্লাহ তাআলা আকাশের উপরে সমুন্নত হওয়ার দলীলসমূহঃ

আল্লাহ তাআলা যে আকাশের উপরে আছেন, কুরআনে এর অনেক দলীল রয়েছে।

১) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ
أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الأَرْضَ.
তোমরা কি নিরাপত্তা পেয়ে গেছো যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেন না? (সূরা মুল্‌কঃ ১৬)
২) আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ.
তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, যিনি তাদের উপরে আছেন। (সূরা নাহ্‌লঃ ৫০)
৩) আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ.
তাঁরই দিকে পবিত্র বাক্যসমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাকে উন্নীত করে। (সূরা ফাতিরঃ ১০)
৪) আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ
تَعْرُجُ المَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ.
ফেরেশতা এবং রূহ (জিবরীল) তাঁর দিকে উর্ধ্বগামী হয়। (সূরা মাআরেজঃ ৪)
৫) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ
يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ.
আল্লাহ্ তাআলা আকাশ থেকে পৃ থিবীপর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন। (সূরা সিজদাহঃ ৫)
৬) আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ তাআলা
إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ.
যখন আল্লাহ বললেনঃ হে ঈসা! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মৃ ত্যুদান করব। অতঃপর তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নিবো। (সূরা আল-ইমরানঃ ৫৫) আল্লাহ্ তাআলাউপরে আছেন- এ মর্মে আরো অনেক দলীল রয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা আসমানে সমুন্নত হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত সহীহ হাদীছসমূহঃ
আল্লাহ্ তাআলা উপরে আছেন-হাদীছ শরীফে এ ব্যাপারে অগণিত দলীল রয়েছে।
১) আওআলের হাদীছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ
(والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ)
তার উপর আল্লাহর আরশ। আর আল্লাহ্ আরশের উপরে। তিনি তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন।

আওআলের হাদীছের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রাঃ) বলেনঃ আমরা একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খোলা ময়দানে বসা ছিলাম। তখন আমাদের মাথার উপর দিয়ে একটি মেঘখন্ড অতিক্রম করার সময় তিনি বললেনঃ তোমরা কি জান এটি কী? আমরা বললামঃ এটি একটি মেঘের খন্ড। অতঃপর তিনি বললেনঃ তোমরা কি জান আকাশ ও পৃ থিবীর মাঝখানের দূরত্ব কতটুকু? আমরা বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ উভয়ের মধ্যে রয়েছে পাঁচশত বছরের দূরত্ব। এমনি প্রত্যেক আকাশ ও তার পরবর্তী আকাশের মধ্যবতী দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বছরের পথ। এভাবে সপ্তম আকাশের উপর রয়েছে একটি সাগর। সাগরের গভীরতা হচ্ছে আকাশ ও যমীনের মধ্যবতী দূরত্বের সমান। সাগরের উপরে রয়েছে আটটি জংলী পাঠা। তাদের হাঁটু থেকে পায়ের খুর পর্যন্ত দূরত্ব আকাশ ও যমীনের মধ্যবতী দূরত্বের সমান। তারা আল্লাহর আরশ পিঠে বহন করে আছে। আরশ এত বিশাল যে, তার উপরের অংশ থেকে নীচের অংশের দূরত্ব হচ্ছে আকাশ ও যমীনের মধ্যবতী দূরত্বের সমান। আর আল্লাহ্ তাআলা হচ্ছেন আরশের উপরে।

২) সাদ বিন মুআয যখন বনী কুরায়যার ব্যাপারে ফয়সালা দান করলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ তুমি তাদের ব্যাপারে সেই ফয়সালা করেছো, যা সাত আসমানের উপর থেকে আল্লাহ্ তাআলাকরেছেন।
৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা জনৈক দাসীকে বললেনঃ আল্লাহ্ কোথায়? দাসী বললঃ আকাশে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন দাসীর মালিককে বললেনঃ তুমি তাকে মুক্ত করে দাও। কারণ সে মুমিন।
৪) আল্লাহ্ তাআলাআকাশের উপরে। মিরাজের ঘটনায় বর্ণিত হাদীছগুলো তার সুস্পষ্ট দলীল।
৫) পালাক্রমে ফেরেশতাদের দুনিয়াতে আগমণের হাদীছেও আল্লাহ্ তাআলা আকাশের উপরে সমুন্নত হওয়ার দলীল রয়েছে। হাদীছের বিস্তারিত বিবরণ এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ
(يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ)
তোমাদের নিকট রাতে একদল ফেরেশতা এবং দিনে একদল ফেরেশতা পালাক্রমে আগমণ করে থাকে। তারা ফজর ও আসরের নামাযের সময় একসাথে একত্রিত হয়। অতঃপর তোমাদের কাছে যে দলটি ছিল, তারা উপরে উঠে যায়। মহান আল্লাহ জানা সত্ত্বেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় ছেড়ে এসেছ? তাঁরা বলেনঃ আমরা তাদেরকে নামায অবস্থায় ছেড়ে এসেছি এবং যখন তাদের কাছে গিয়েছিলাম, তখন তারা নামাযেই ছিল।
৬) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ
(مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ)
যে ব্যক্তি বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ হতে একটি খেজুর পরিমাণ সম্পদ দান করে, আর আল্লাহর নিকট তো পবিত্র ব্যতীত কোন কিছুই উর্ধ্বমুখী হয় না, আল্লাহ্ ঐ দান স্বীয় ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তা দানকারীর জন্য প্রতিপালন করতে থাকেন। যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের ঘোড়ার বাচ্চাকে প্রতিপালন করে থাকে। শেষ পর্যন্ত ঐ দান পাহাড় সমুতল্য হয়ে যায়।
৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেনঃ
(إِذَا قَضَى اللَّهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسِّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ)
আল্লাহ তাআলাযখন আকাশে কোন বিষয়ে ফয়সালা করেন, তখন ফেরেশতাগণ আল্লাহর উক্ত ফয়সালার প্রতি অনুগত হয়ে তাদের পাখাসমূহ এমনভাবে নাড়াতে থাকেন যার ফলে শক্ত পাথরে শিকল দিয়ে প্রহার করলে যে ধরণের আওয়াজ হয় সে রকম আওয়াজ হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা আকাশের উপরে আছেন বাতিল ফির্কা ব্যতীত কেউ তা অস্বীকার করেনি।

আরশের উপর সমুন্নত হওয়ার দলীলসমূহঃ

কুরআন মজীদের সাতটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি আরশের উপর সমুন্নত।
১) আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى.
দয়াময় আল্লাহ আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। (সূরা তোহাঃ ৫)
২) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ
إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ.
নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। তিনি আসমান-কুরবানীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। (সূরা আরাফঃ ৫৪)
৩) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ
اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ.

আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমন্ডলী স্থাপন করেছেন বিনা স্তম্ভে। তোমরা এটা দেখছো। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। (সূরা রাদঃ ২)

৫) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ.

অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি পরম দয়াময়। (সূরা ফুরকানঃ ৫৯)

৬) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ.

আল্লাহই আসমান-যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যবর্তী সকল বস্তু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন। (সূরা সাজদাহঃ ৫৪)

৭) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ.

আল্লাহই আসমান-যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশের উপরে সমুন্নত হয়েছেন"। (সূরা হাদীদঃ ৪)

২) অলী-আওলীয়াদের আহবানঃ

সুফীদের বিরাট একটি অংশ নবী-রাসূল এবং জীবিত ও মৃত অলী-আওলীয়াদের কাছে দুআ করে থাকে। তারা বলে থাকেঃ ইয়া জিলানী, ইয়া রিফাঈ, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইত্যাদি। অথচ আল্লাহ তাআলা তাঁকে ছাড়া অন্যেকে আহবান করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দুআ করবে, সে মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ.

তুমি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুকে ডাকবে না যে তোমার উপকার কিংবা ক্ষতি কোনটিই করতে পারে না। যদি তুমি তাই কর তবে তুমি নিশ্চিত ভাবেই জালেমদের মধ্যে গন্য হবে। (সূরা ইউনুসঃ ১০৬)।

আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ.

এবং ঐ ব্যক্তির চেয়ে আর কে বেশী পথভ্রষ্ট যে আল্লাহ ব্যতীত এমন ব্যক্তিদেরকে আহবান করে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিবে না এবং তারা তাদের ঐ আহবান থেকে সমপূর্ণ বেখবর রয়েছে? (সূরা আহকাফঃ ৫)

৩) গাউছ, কুতুব, আবদাল ও নুজাবায় বিশ্বাসঃ

সুফীরা বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে কতিপয় আবদাল, কুতুব এবং আওলীয়া আছেন, যাদের হাতে আল্লাহ তাআলা পৃথিবী পরিচালনার কিছু কিছু দায়িত্ব সোপর্দ করে দিয়েছেন। সুতরাং তারা তাদের ইচ্ছামত পৃথিবীর কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকেন।

তাবলীগি নেসাব ফাযায়েলে আমাল বইয়ে এই ধরণের একটি ঘটনা উল্লেখ আছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, হজরত শাইখুল বলেছেনঃ আমি আমার আব্বাজানের নিকট প্রায়ই একটা ঘটনা শুনতাম। উহা এই যে, জনৈক ব্যক্তি বিশেষ কোন প্রয়োজনে পানি পথে যাইতেছিল। পথিমধ্যে যমুনা নদী পড়িল, তাহার অবস্থা তখন এত ভয়ঙ্কর ছিল যে, নৌকা চলাও মুশকিল ছিল, লোকটি পেরেশান হইয়া গেল। লোকজন তাহাকে বলিল অমুক জঙ্গলে একজন কামেল লোক থাকেন, তাহার নিকট গিয়া স্বীয় প্রয়োজন পেশ কর। তিনি নিশ্চয়ই কোন ব্যবস্থা করিবেন। তবে তিনি প্রথমে রাগ করিবেন। তাহাতে তুমি নিরাশ হইও না। লোকটি তাহাদের কথায় জঙ্গলের মধ্যে গিয়া দেখিলেন সেই দরবেশ তাহার বিবি বাচ্চাসহ একটি ঝুপড়ির মধ্যে বাস করিতেছে। সেই ব্যক্তি স্বীয় প্রয়োজন ও যমুনার অবস্থা বর্ণনা করিল, দরবেশ প্রথমে অভ্যাস মোতাবেক রাগ করিয়া বলিল, আমার হাতে কি আছে? আমি কি করিতে পারি? লোকটি কান্নাকাটি করিয়া আপন সমস্যার কথা বলিল, তখন দরবেশ বলিলঃ যাও, যমুনার কাছে গিয়া বলঃ আমাকে ঐ ব্যক্তি পাঠাইয়াছে, যে

জীবনে কখনও কিছু খায় নাই এবং বিবির সহিত সহবাস করে নাই। লোকটি যমুনায় গিয়া দরবেশের কথা জানাইল। যমুনা তাহার কথা মত শান্ত হইয়া গেল। সেই লোকটি পার হইয়া যাওয়ার পর যমুনা আবার ভীষণ আকার ধারণ করিল। (দেখুনঃ ফাযায়েলে আমাল, দ্বিতীয় খন্ড, ১৬২ পৃ ষ্ঠা)

প্রিয় পাঠক বৃ ন্দলক্ষ্য করুন, এটি এমন একটি বিশ্বাস যা মক্কার মুশরিকরাও পোষণ করতো না। তারা যখন সাগর পথে ভ্রমণ করার সময় বিপদে আক্রান্ত হত, তখন তারা সকল দেব-দেবীর কথা ভুলে গিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য এক মাত্র আল্লাহকেই ডাকতো। আল্লাহ তাআলা মক্কার মুশরিকদের সেই কথা কুরআনে উল্লেখ করে বলেনঃ

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্কে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে। (সূরা আনকাবুতঃ ৬৫) অথচ বর্তমান সময়ের অসংখ্য মুসলিমকে দেখা যায় তারা চরম বিপদের সময়ও আল্লাহকে বাদ দিয়ে কল্পিত অলী-আওলীয়াদেরকে আহবান করে থাকে, যা মক্কার মুশরিকদের শির্ককেও হার মানিয়েছে। কেননা মক্কার লোকেরা শুধু সুখের সময়ই আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করতো, কিন্তু বিপদের সময় তারা সেগুলোকে ভুলে গিয়ে এক মাত্র আল্লাহকেই ডাকতো। আর বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর সাথে শির্ক করছে। এদিক থেকে মূল্যায়ন করলে দেখা যায় বর্তমানের মাজার পূজারী মুসলিমের শির্কের চেয়ে মক্কার আবু জাহেল ও আবু লাহাবদের শির্ক অধিক হালকা ছিল। মোটকথা মক্কার মুশরিকদের তাওহীদে রুবুবীয়া সমপর্কে যে অগাধ বিশ্বাস ছিল তা উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ .
وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

হে নবী! আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে কে রুযী দান করেন? কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃ তেরভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃ তকেজীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সমপাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছ না? (সূরা ইউনুসঃ ৩১)

তিনি আরও বলেনঃ

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ.

তিনি আকাশ থেকে পৃ থিবীপর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন। (সূরা সাজদাঃ ৫) এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে غوث ،অর্থ হচ্ছে ত্রাণকর্তা। এটি আল্লাহর গুণ। কোন মানুষ গাউছ হতে পারে না। ঢাকা শহরের মহাখালীতে মাসজিদে গাউছুল আযম নামে বিশাল একটি মসজিদ রয়েছে। আমরা সকলেই জানি এখানে গাউছুল আযম দ্বারা বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীকে বুঝানো হয়েছে। আল-গাউছুল আল-আযাম অর্থ হচ্ছে মহান ত্রাণকর্তা। যারা আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)কে মহা ত্রাণকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করেন, তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো, তারা কি এ ধরণের কথার মাধ্যমে বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)কে আল্লাহর সমান করে দেন নি? শুধু তাই নয় সুফীদের একটি দল বিশ্বাস করে যে, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী নিজ হাতে লাওহে মাহফুযে নতুন করে বৃ দ্ধিকরতে বা তা থেকে কিছু কমানোরও অধিকার রাখেন। (নাউযুবিল্লাহ)

৪) সুফী তরীকার মাশায়েখগণ বিপদ হতে উদ্ধার করতে পারেনঃ

সুফীরা বিশ্বাস করেন যে, তাদের মাশায়েখ ও অলীগণ বিপদ হতে উদ্ধার করতে সক্ষম। তাই বিপদে তারা তাদের অলীদেরকে আহবান করে থাকে। তারা বলে থাকে মদদ ইয়া আব্দুল কাদের জিলানী, হে উমুক, হে উমুক ইত্যাদি। এভাবে বিপদাপদে পড়ে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আহবান করা প্রকাশ্য শির্কের অন্তর্ভূক্ত আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নাই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (সূরা আনআমঃ ১৭) আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ্ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধু একজন ভীতিপ্রদর্শক ও সুসংবাদাতা ঈমানদারদের জন্য। (সূরা আরাফঃ ১৮৮)

৫) এবাদতের সময় সুফীদের অন্তরের অবস্থাঃ

সুফীরা দ্বীনের সর্বোচ্চ স্তর তথা ইহসানের ক্ষেত্রে তাদের নিজ নিজ মাশায়েখদের দিকে মনোনিবেশ করে থাকে। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك

ইহসান হল, এমনভাবে তুমি আল্লাহ পাকের ইবাদত করবে যেন তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি তাঁকে দেখতে না পাও তবে বিশ্বাস করবে যে, তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন। (সহীহ মুসলিম)

৬) নবী-রাসূলদের সমপর্কে সুফীদের ধারণাঃ

নবী-রাসূলদের ব্যাপারে সুফীদের বিভিন্ন ধারণা রয়েছে। তাদের কতিপয়ের কথা হচ্ছেঃ

خضنا بحراً وقف الأنبياء بساحله

অর্থাৎ আমরা এমন সাগরে সাতার কাটি, নবীগণ যার তীরে দাঁড়িয়ে থাকেন। অর্থাৎ সুফীগণ এমন মর্যাদায় পৌঁছতে পারেন, যা নবীদের পক্ষেও সম্ভব নয়।

৭) অলী-আওলীয়াদের ব্যাপারে তাদের বিশ্বাসঃ

অলী-আওলীয়াদের ক্ষেত্রে সুফীদের আকীদা হচ্ছে, তাদের কেউ নবীদের চেয়ে অলীগণকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, অলীগণ এবং আল্লাহর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহর সকল গুণই অলীদের মধ্যে বর্তমান। যেমন সৃষ্টিকরা, রিযিক প্রদান করা, কাউকে জীবন দান করা, কাউকে মৃত্যু দান করা ইত্যাদি আরও অনেক। এ জাতীয় বিশ্বাস যে শির্ক তাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

৮) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে বাড়াবাড়িঃ সুফীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নূরের তৈরী মনে করে। তারা নিম্নের বানোয়াট হাদীছটিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে থাকে।

أول ما خلق الله تعالى نوري

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন শব্দে একই অর্থে সুফীদের কিতাবে সনদবিহীন ভাবে এই বানোয়াট হাদীছটি উল্লেখিত হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই আমাদের দেশের অধিকাংশ সুন্নী মুসলমানও এই আকীদাই পোষণ করে থাকে। অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীছের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরের তৈরী ছিলেন না এবং তিনি সর্বপ্রথম সৃষ্টিওছিলেন না। সহীহ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টিকরেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم ، وأمره أن يكتب كل شيء يكون

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যে জিনিষটি সৃষ্টিকরেছেন, তা হচ্ছে কলম। তারপর কলমকে কিয়ামত পর্যন্ত যা হবে তা লিখতে বললেন। (সিলসিলায়ে সাহীহা, হাদীছ নং- ১৩৩) তিনি আরও বলেনঃ

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ: لَهُ اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টিকরে তাকে বললেনঃ লিখ। কলম বললঃ হে আমার প্রতিপালক! কী লিখব? আল্লাহ্ বললেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত আগমণকারী প্রতিটি বস্তুর তাকদীর লিখ।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরের তৈরীও ছিলেন না। তিনি মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
হে নবী! আপনি বলুন যে, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। (সূরা কাহাফঃ ১১০) এ ছাড়া কুরআনের আরও অনেক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী আদমেরই একজন ছিলেন। সুতরাং সমস্ত বনী আদম যেহেতু মাটির তৈরী, তাই তিনিও একজন মাটির তৈরী মানুষ ছিলেন। কেবল ফেরেশতাকেই আল্লাহ নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে সহীহ বুখারীতে আয়েশা (রাঃ)এর হাদীছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ
خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ
ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টিকরা হয়েছে নূর থেকে। জিনদেরকে সৃষ্টিকরা হয়েছে ধোঁয়া বিহীন অগ্নি থেকে। আর আদমকে সৃষ্টিকরা হয়েছে ঐ বস্তু থেকে যার বিবরণ তোমাদের কাছে পেশ করা হয়েছে। (সহীহ মুসলিম) সুতরাং তিনি মাটির তৈরী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাকে নবুওয়ত ও রেসালাতের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সুফীরা আরও বিশ্বাস করে যে, তিনি হচ্ছেন সৃষ্টিজগতের কুব্বা তথা গম্বুজ। তিনি আরশে সমাসীন। সাত আসমান, সাত যমীন আরশ-কুরসী, লাওহে মাহফুয, কলম এবং সমগ্র সৃষ্টিগত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কথার সত্যতা যাচাই করতে বুসেরীর কাসীদাতুল বুরদার একটি লাইন দেখুনঃ
فإنَّ من جودك الدنيا وضرَّتها + ومن علومك علم اللوح والقلم
হে নবী! আপনার দয়া থেকেই দুনিয়া ও আখেরাত সৃষ্টিহয়েছে। আর আপনার জ্ঞান থেকেই লাওহে মাহফুয ও কলমের জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়েছে। সুফীদের কতিপয় লোকের বিশ্বাস যে, তিনি হচ্ছেন সর্বপ্রথম সৃষ্টি। এটিই প্রখ্যাত সুফী সাধক ইবনে আরাবী ও তার অনুসারীদের আকীদা। কতিপয় সুফীবাদের মাশায়েখ এমতকে সমর্থন করেন না; বরং তারা এ কথাগুলোর প্রতিবাদ করেন এবং তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানুষ মনে করেন ও তাঁর রেসালাতের স্বীকৃতি প্রদান করেন। তবে তারা রাসূলের কাছে শাফাআত প্রার্থনা করেন, আল্লাহর কাছে তাঁর উসীলা দিয়ে দুআ করেন এবং বিপদে পড়ে রাসূলের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে থাকেন। আসুন দেখি বুসেরী তার কবিতায় কি বলেছেনঃ
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به + سواك عند حلول الحوادث العمم
হে সৃষ্টির সেরা সম্মানিত! আমার জন্য কে আছে আপনি ব্যতীত, যার কাছে আমি কঠিন বালা মসীবতে আশ্রয় প্রার্থনা করবো? (নাউযুবিল্লাহে) সুফীবাদের সমর্থক ভাইদের কাছে প্রশ্ন হলো বুসেরীর কবিতার উক্ত লাইন দুটির মধ্যে যদি শির্ক না থাকে, তাহলে আপনারাই বলুন শির্ক কাকে বলে? পরিতাপের বিষয় হচ্ছে আমাদের দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসে শির্ক মিশ্রিত এ জাতীয় কবিতা পাঠ্য করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী এগুলো পাঠ করে ইসলামী শিক্ষার নামে শির্ক ও বিদআতী শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে। আমাদের জাতীয় পর্যায়ের শিক্ষকগণ যদি শির্ক মিশ্রিত সিলেবাস
নির্ধারণ করে তা দিয়ে আমাদের জাতি গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন, তাহলে আমরা তাওহীদের সঠিক শিক্ষা পাবো কোথায়?

৯) ফেরাউন ও ইবলীসের ক্ষেত্রে সুফীদের বিশ্বাসঃ

সুফীদের কতিপয় লোক ইবলীস ও ফেরাউনকে পরিপূর্ণ ঈমানদার ও আল্লাহর শ্রেষ্ট বান্দা মনে করে। সুফী দর্শনের মতে ইবলীস সর্বোত্তম সৃষ্টির অন্তর্ভূক্ত এবং সে পরিপূর্ণ ঈমানদার।
আর মিশরের ফেরাউন সম্পর্কে সুফীদের কতিপয়ের কথা হচ্ছে, ঈমানের পরিপূর্ণ হাকীকত অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিল বলেই সে একজন সৎ লোক ছিল। ফিরআউনের কথাঃ أنا ربكم الأعلى আমি তোমাদের মহান প্রভু এর তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে সুফীরা বলেঃ ফিরআউন নিজের ভিতরে উলুহীয়াতের অস্থিত্ব খুঁজে পেয়েছিল বলেই এ রকম কথা বলেছে। কেননা তাদের মতে পৃথিবীরপ্রতিটি বস্তুই আল্লাহ। সুতরাং

প্রতিটি সৃষ্টিই এবাদত পাওয়ার অধিকার রাখে। সুতরাং যে ব্যক্তি ইবলীসের এবাদত করল, সে আল্লাহরই এবাদত করল এবং যে ফিরআউনের এবাদত করল সে আল্লাহরই এবাদত করল। (নাউযুবিল্লাহ)

মানসুর হাল্লাজ এবং ইবনে আরাবী মনে করে, শয়তানকে আল্লাহর রহমত থেকে বিতারিত করা হয় নি এবং সে জাহান্নামীও নয়। সে তাওবা করে পরিশুদ্ধ হয়ে জান্নাতী হয়ে গেছে। হাল্লাজ সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছে যে, শয়তান ও ফিরআউন হচ্ছে তার আদর্শ ও ইমাম। এই জাতীয় কথা যে, বাতিল ও মিথ্যা তার প্রতিবাদ ছাড়াই ইসলাম সম্পর্কে সামান্য ধারণার অধিকারী অতি সহজেই বুঝতে পারেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয় এবং যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন আদেশ করা হবে, ফেরাউন গোত্রকে কঠিনতর আযাবে দাখিল কর। (সূরা মুমিনঃ ৪৬)

ইবলীস আল্লাহর আদেশ অমান্য করে তাঁর রহমত থেকে বিতারিত হয়ে কাফেরে পরিণত হয়েছে। কিয়ামতের দিন সে তার অনুসারীসহ জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এটি কুরআন ও সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

এবং যখন আমি আদমকে সেজদাহ করার জন্য ফেরেশতাগণকে নির্দেশ দিলাম, তখনই ইবলিস ব্যতীত সবাই সিজদাহ করলো। সে (নির্দেশ) পালন করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার প্রদর্শন করলো। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেল। (সূরা বাকারাঃ ৩৪) আল্লাহ্ তাআলা ইবলীসের জাহান্নামী হওয়া সম্পর্কে বলেনঃ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (١٢) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (١٣) قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤) قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (١٥) قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٧) قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ

আমি যখন নির্দেশ দিয়েছি, তখন তোকে কিসে সেজদাহ করতে বারণ করল ? সে বললঃ আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। বললেন তুই এখান থেকে যা। এখানে অহংকার করার কোন অধিকার তোর নাই। অতএব, তুই বের হয়ে যা। তুই হীনতমদের অন্তর্ভূক্ত। সে বললঃ আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। আল্লাহ্ বললেনঃ তোকে সময় দেয়া হল। সে বললঃ আপনি আমাকে যেমন উদ্‌ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। আল্লাহ্ বললেনঃ বের হয়ে যা এখান থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে।

তাদের যে কেউ তোর পথে চলবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবার দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করে দিব। (সূরা আরাফঃ ১২-১৮)

১০) কবর ও মাজার সম্পর্কে সুফীদের আকীদাঃ

সুফীও সুফিবাদের প্রভাবিত ব্যক্তিগণ অলী-আওলীয়া ও তরীকার মাশায়েখদের কবর পাকা করা, কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ, তাতে বাতি জ্বালানো, কবর ও মাযার যিয়ারত করার উপর বিশেষ গুরত্ব প্রদান করে থাকে। এমন কি সুফীরা বেশ কিছু মাজারের চার পাশে তাওয়াফও করে থাকে মিশরে সায়্যেদ বদভীর কবরের চতুর্দিকে সুফীরা কাবা ঘরের তাওয়াফের ন্যায় তাওয়াফ করে থাকে। অথচ সকল মুসলিমের কাছে অতি সুস্পষ্ট যে তাওয়াফ এমন একটি এবাদত, যা কাবা ঘরের চতুর পার্শ্বে এবং একমাত্র আল্লাহর জন্যই করতে হবে। সুতরাং কোন কবরকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করা বড় শির্ক, যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

এবং তারা যেন এই সুসংরক্ষিত (পবিত্র) গৃহেরতওয়াফ করে। (সূরা হাজ্জঃ ২৯) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে উম্মাতকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেনঃ
اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
হে আল্লাহ্! আমার কবরকে পূজার স্থানে পরিণত করো না, যাতে এর ইবাদত করা হয়। আল্লাহ্ অভিশাপ করেছেন ঐ জাতিকে যারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে কেন্দ্র করে মসজিদ তৈরী করেছে। (মুসনাদে আহমাদ) আবু হুরায়রা (রাঃ) এর সূত্রে বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ
لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
ইহুদী খৃষ্টানদেরপ্রতি আল্লাহ্র লানত। কারণ তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে।

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি আবুল হায়্যায আল আসাদীকে বলেন, আমি কি তোমাকে এমন আদেশ দিয়ে প্রেরণ করব না, যা দিয়ে নবী (সাঃ) আমাকে প্রেরণ করেছিলেন?
أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ
কোন মূর্তি পেলেই তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবে। আর কোন কবর উঁচু পেলেই তা ভেঙ্গে মাটি বরাবর করে দিবে। (মুসলিম)

এমনিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন, কবর পাকা করতে, চুনকাম করতে, তার উপর বসতে, কবরে লিখতে। আর তিনি অভিশাপ করেছেন ঐ সমস্ত ব্যক্তিদেরকে যারা কবরকে মসজিদ বানায় এবং সেখানে বাতি জ্বালায়। (মুসলিম) সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন (রাঃ)এর যুগে ইসলামী শহর সমূহে কোন কবর পাকা করা বা কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা হয় নি। না নবী (সাঃ) এর কবরে না অন্য কারও কবরে। এরপরও কি আমাদের সমাজের বিপথগামী লোকদের হুশ হবে না?

১১) মৃতআওলীয়ার নামে মান্নত পেশ করাঃ

সুফীবাদে বিশ্বাসীগণ মৃতঅলী-আওলীয়াদের কবর ও মাজারের জন্য গরু, ছাগল, হাস-মুরগী-কবুতর, টাকা-পয়সা ইত্যাদি মানত করাকে ছাওয়াবের কাজ মনে করে থাকে। অথচ কুরআন ও সহীহ হাদীছের মাধ্যমে জানা যায় যে মানত হচ্ছে বিরাট একটি এবাদত, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে করা সম্পূর্ণ শির্ক।

সুতরাং মান্নত যেহেতু আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত, তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জনের জন্য তা পেশ করা শির্ক। যেমন কেউ বললঃ উমুক ব্যক্তির জন্য নযর মেনেছি। অথবা এই কবরের জন্য আমি মান্নত করেছি, অথবা জিবরীল (আঃ) এর জন্য আমার মানত রয়েছে। উদ্দেশ্য হল এগুলোর মাধ্যমে তাদের নৈকট্য অর্জন করা। নিঃসন্দেহে ইহা শির্কে আকবরের অন্তর্গত। এ থেকে তাওবা করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ
তোমরা যাই খরচ কর বা নযর মান্নত কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবগত থাকেন। আর জালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা বাকারাঃ ২৭০) কোন বস্তুকে আল্লাহ্র ইলমের সাথে সম্পৃক্তকরা হলে সে বিষয় হল ছাওয়াব অর্জনের স্থান। আর যে বিষয়ে ছওয়াব পাওয়া যায় সেটাই তো ইবাদত। আর ইবাদত মাত্রই গাইরুল্লাহর জন্য সমপাদন করা অবৈধ। আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا .
তারা মান্নত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী। (সূরা দাহ্রঃ ৭) আর এ ধরণের মান্নত যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের আশায় করা হয়, যেমন কেউ মান্নত করল, আমি আজমীর শরীফে কিংবা বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী অথবা খাজা বাবার উদ্দেশ্যে একটি ছাগল যবাই করবো, তাহলে শির্ক হবে এবং তা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব।

১২) অলী-আওলীয়ার উসীলাঃ

সকল প্রকার সুফী তরীকার লোকদের আকীদার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এই যে, তারা মৃত অলীদের উসীলা দিয়ে দুআ করে থাকেন, গুনাহ্ থেকে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। উসীলা অর্থ হচ্ছে, যার মাধ্যমে কারও নৈকট্য অর্জন করা যায়, তাকে উসীলা বলা হয়। আর কুরআন ও হাদীছের পরিভাষায় যে সমস্ত বিষয় দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায়, তাকে উসীলা বলা হয়। কুরআন মাযীদে আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নিকট উসীলা প্রার্থনা কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা মায়িদাঃ ৩৫) সাহাবী, তাবেয়ী এবং পূর্ববর্তী সম্মানিত উলামায়ে কিরাম থেকে উসীলার যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তা হল ভাল আমল করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। ইমাম ইবনে যারীর (রঃ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ আল্লাহর সন্তোষ জনক আমল করার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা কর। ইমাম ইবনে কাছীর (রঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করে বলেন, উসীলা অর্থ নৈকট্য। মুজাহিদ, হাসান, আবদুল্লাহ ইবনে কাছীর, সুদ্দী এবং ইবনে যায়েদ থেকেও অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। কাতাদাহ (রঃ) বলেন, আল্লাহর আনুগত্যমূলক এবং সন্তোষ জনক কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর। উপরোক্ত কথাগুলো বর্ণনা করার পর ইবনে কাছীর (রঃ) বলেন, উসীলার ব্যাখ্যায় যা বলা হলো, এতে ইমামদের ভিতরে কোন মতবিরোধ নেই। কাজেই আয়াতের মাঝে উসীলার অর্থ অত্যন্ত সুসপষ্ট। (দেখুন তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৩/১০৩) উপরোক্ত আয়াতকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে যারা আম্বীয়ায়ে কিরাম, আওলীয়াদের ব্যক্তিসত্বা এবং তাদের সম্মানের উসীলা দেয়া বৈধ মনে করে, তাদের ব্যাখ্যা সমপূর্ণ বাতিল এবং কুরআনের আয়াতকে পরিবর্তনের শামিল। এমনকি কুরআনের আয়াতকে এমন অর্থে ব্যবহার করা, যার কোন সম্ভাবনা নেই এবং যার পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন মুফাসসিরের উক্তি নেই। আমাদের দেশের কিছু তথাকথিত আলেম উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলে থাকে, আল্লাহ তায়ালা এখানে পীর ধরতে বলেছেন। পীরই হলো উসীলা। পীর না ধরলে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না। এ ধরণের ব্যাখ্যা সমপূর্ণ বানোয়াট। পূর্ব যুগের গ্রহণযোগ্য কোন আলেম এ ধরণের ব্যাখ্যা করেন নি।

১৩) ইসলামের রুকনগুলো পালনের ক্ষেত্রে সুফীদের দৃষ্টিভঙ্গিঃ সুফীবাদে বিশ্বাসীগণ মনে করেন যে, তাদের কল্পিত অলীদের উপর নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কোন কিছুই ফরজ নয়। কেননা তারা এমন মর্যাদায় পৌঁছে যান, যেখানে পৌঁছতে পারলে এবাদতের প্রয়োজন হয় না। তাদের কথা হচ্ছেঃ

إذا حصلت المعرفة سقطت العبادة

মারেফত হাসিল হয়ে গেলে এবাদতের কোন প্রয়োজন নেই। তারা তাদের মতের পক্ষে কুরআনের একটি আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

তুমি ইয়াকীন আসা পর্যন্ত তোমার রবের এবাদত কর। (সূরা হিজিরঃ ৯৯) সুফীরা বলে থাকে এখানে ইয়াকীন অর্থ হচ্ছে, মারেফত। এই মারেফত হাসিল হওয়ার পূর্ণ পর্যন্ত আল্লাহর এবাদত করতে হবে। তা হাসিল হয়ে গেলে এবাদতের আর কোন প্রয়োজন নেই। তাদের এই কথাটি সম্পূর্ণ বাতিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ)সহ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে ইয়াকীন অর্থ হচ্ছে, মৃত্যু।(দেখুনঃ ইবনে কাছীরঃ (৪/৫৫৩ (

সুতরাং তাদের কথা হচ্ছে নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি এবাদত সাধারণ লোকেরা পালন করবে।

১৪) সুফীদের যিকির ও অযীফাঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মুসলিম ঘুম থেকে উঠে, ঘুমানোর সময়, ঘরে প্রবেশ কিংবা ঘর হতে বের হওয়ার সময় থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পঠিতব্য অসংখ্য যিকির-আযকার শিখিয়েছেন। কিন্তু সমস্ত সুফী তরীকার লোকেরা এ সমস্ত যিকির বাদ দিয়ে বিভিন্ন ধরণের বানোয়াট যিকির তৈরী করে নিয়েছে। নকশবন্দী তরীকার লোকেরা যিকরে মুফরাদ তথা শুধু) الله আল্লাহ) الله (আল্লাহ) বলে

যিকির করে। শাযেলী তরীকার لا إله إلا الله এবং অন্যান্য তরীকার লোকে শুধু هو هو হু হু বলে যিকির করে থাকে। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ এভাবে আওয়াজ করে বা আওয়াজবিহীন একক শব্দ দ্বারা যিকির করার কোন দলীল নেই; বরং এগুলো মানুষকে বিদআত ও গোমরাহীর দিকে নিয়ে যায়। (মাজমুআয়ে ফতোয়াঃ পৃ ষ্ঠানং- ২২৯) আমাদের দেশের বিভিন্ন পীরদের মুরীদদেরকে যিকরে জলী ও যিকিরী খফী নামে বিভিন্ন ধরণের বিদআতী যিকির করতে দেখা যায়, যেগুলোর কোন শরঈ ভিত্তি নেই।

১৫) চুলে ও দাড়িতে ঝট বাঁধাঃ

সুফীবাদের নামে কতিপয় লোকের মাথায় ও দাড়িতে ঝট বাঁধতে দেখা যায়, কারও শরীরে লোহার শিকল, কাউকে উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় দেখা যায়। এটি সাহাবী, তাবেয়ী বা তাদের পরবর্তী যুগের কোন আলেম বা সাধারণ সৎ লোকের নিদর্শন ছিল না। এমন কি আব্দুল কাদের জিলানী, শাইখ আহমাদ রেফায়ী এবং সুফীরা যাদেরকে সুফীবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করেন তাদের কেউ এ ধরণের লেবাস গ্রহণ করেন নি।

১৬) অলী-আওলীদের নামে শপথঃ

অলী-আওলীয়ার নামে শপথ করা সুফী তরীকার লোকদের একটি সাধারণ ব্যাপার। অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেনঃ

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল সে শির্ক করল। (আবু দাউদ)

১৭) হালাল-হারামঃ যে সমস্ত সুফী ওয়াদাতুল উজুদে বিশ্বাসী তারা কোন কিছুকেই হারাম মনে করে না। মদ, জিনা-ব্যভিচারসহ সকল প্রকার কবীরা গুনাহতে লিপ্ত হওয়াই তাদের জন্য বৈধ।

১৮) জিন-ইনসান সৃ ষ্টিরউদ্দেশ্যঃ

সুফীদের কথা হচ্ছে, জিন-ইনসানসহ সমস্ত সৃষ্টি জগত নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য সৃ ষ্টিকরা হয়েছে। আফসোসের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের অনেক বক্তাকেই অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে ওয়াজ করার সময় এবং মিলাদ শরীফ পাঠের সময় বলতে শুনা যায় যে, নবী না আসিলে ধরায় কোন কিছুই সৃ ষ্টিহত না। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

আর আমি মানব এবং জিনকে কেবল আমার দাসত্ব করার জন্য সৃ ষ্টিকরেছি। (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬) সুতরাং জিন-ইনসান ও অন্যান্য সৃ ষ্টির উদ্দেশ্য একটাই। আর তা হচ্ছে মহান আল্লাহর এবাদত তথা পৃ থিবীতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা।

১৯) সুফীরা জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভয় করে নাঃ

সুফীরা মনে করেন জাহান্নামের ভয়ে এবং জান্নাতের আশায় আমল করা ঠিক নয়। তাদের কথা হচ্ছে আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়াই সুফী সাধকের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ.

তারা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা আশা ও ভীতি (জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভীতি) সহকারে আমাকে ডাকত এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত। (সূরা আম্বীয়াঃ ৯০)

২০) গান-বাজনাঃ

সুফীবাদের দাবীদার কিছু লোক গান, বাজনা ও নৃ ত্যের মাধ্যমে যিকির করে থাকে। অথচ ইসলাম এগুলোকে সুস্পষ্টভাবে হারাম বলে ঘোষণা করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আখেরী যামানায় কোন কোন জাতিকে মাটির নিচে দাবিয়ে দেয়া হবে, কোন জাতিকে উপরে উঠিয়ে নিক্ষেপ করে ধ্বংস করা হবে। আবার কারো চেহারা পরিবর্তন করে শুকর ও বানরে পরিণত করা হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো কখন এরূপ করা হবে? তিনি বললেনঃ যখন গান-বাজনা এবং গায়িকার সংখ্যা বৃ দ্ধিপাবে। (ইবনে মাজাহ)

২১) সুফীদের যাহেরী ও বাতেনীঃ

সুফীরা দ্বীনকে যাহেরী ও বাতেনী এই দুটি স্তরে ভাগ করে থাকে। শরীয়তকে তারা যাহেরী স্তর হিসেবে বিশ্বাস করে, যা সকলের জন্য মান্য করা জরুরী। বাতেনী স্তর পর্যন্ত শুধু নির্বাচিত ব্যক্তিরাই পৌঁছতে পারে। ইসলামী শরীয়তে যাহেরী ও বাতেনী বলতে কিছু নেই। কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে যা আছে, তাই ইসলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

(عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ)

আমার পরে তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অনেক মতবিরোধ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা সে সময় আমার সুন্নাত এবং খোলাফায়ে রাশেদার সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে তোমরা দ্বীনের মাঝে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা থেকে বিরত থাকবে, কেননা প্রত্যেক নতুন বিষয়ই বিদআত। আর প্রতিটি বিদআতের পরিণাম গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা। (আবু দাউদ, অধ্যায়ঃ কিতাবুস্ সুন্নাহ, তিরমিযী, অধ্যায়ঃ কিতাবুল ইল্ম। ইমাম তিরমিযী বলেনঃ হাদীছটি হাসান সহীহ। মুসনাদে আহমাদ, (৪/১২৬), মাজমুওয়ায়ে ফাতাওয়া ১০/৩৫৪)

২২) শায়েখ বা পীরের আনুগত্যঃ

সুফীবাদের কথা হচ্ছে, চোখ বন্ধ করে এবং বিনা শর্তে সুফী তরীকার পীর বা শায়েখের আনুগত্য করতে হবে এবং মুরীদদেরকে তাদের সামনে পাপ করে থাকলে তা স্বীকার করতে হবে। ভক্তরা পীরের হাতে সেরকম আটকা থাকবে যেমন গোসল দাতার হাতে মৃ তব্যক্তি।

২৩) পীরের আত্মার সাথে মুরীদের আত্মার সম্পর্ক তৈরী করাঃ

সুফীদের কথা হচ্ছে শত শত বই-পুস্তক পাঠ করে কোন মুমিন সঠিক পথে চলতে পারবে না। পীর বা শায়েখের অন্তরের সাথে মুরীদের অন্তর যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত দ্বীনি ইলম ও আমলে পরিপক্ক হওয়া যাবে না।

২৪) ইলমে লাদুন্নী নামে কল্পিত এক বিশ্বাসঃ

সুফীরা বেশী বেশী ইলমে লাদুন্নীর কথা বলে থাকে। ইলমে লাদুন্নী বলতে তারা বুঝাতে চায় যে, এটি এমন একটি ইলম যা আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষভাবে সুফীরা পেয়ে থাকে। সাধনা ও চেষ্টার মাধ্যমে এটি অর্জন করা যায় না। তাদের কল্পিত কথা হচ্ছে অলী-আওলীয়ারা আল্লাহর পক্ষ হতে ইলমে লাদুন্নী অর্জন করে থাকে।

তাদের বানোয়াট কথার মধ্যে এটিও একটি বানোয়াট ও কল্পিত কথা এবং আল্লাহর নামে চরম মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। এই উম্মতের প্রথম কাতারের সৎ লোক তথা সাহাবীদের মাঝে এ ধরণের কথা শুনা যায় নি। তারা ঈমান, আমল ও তাকওয়ায় এত বেশী অগ্রগামী ছিলেন যে, আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রশংসায় কুরআনে একাধিক আয়াত নাযিল করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অনেককেই জান্নাতী বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

২৫) কারামাতে আওলীয়ার ক্ষেত্রে সুফীদের বাড়াবাড়িঃ

কারামতে আওলীয়ার ব্যাপারে আহ্লুস্ সুন্নাতের বিশ্বাস হচ্ছে আউলীয়াদের কারামত এবং আল্লাহ তাআলাতাদের হাতে অলৌকিক ও সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত যে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করে থাকেন আমরা তাতে বিশ্বাস করি। তবে অলী হওয়ার জন্য কারামত প্রকাশিত হওয়া জরুরী নয়। আওলীয়াদের কারামত সত্য। আল্লাহ তাআলা তাদের হাতে অলৌকিক ও সাধারণ নিয়মের বিপরীত এমন ঘটনা প্রকাশ করে থাকেন যাতে তাদের কোন হাত নেই। তবে কারামত চ্যালেঞ্জ আকারে প্রকাশিত হয় না; বরং আল্লাহই তাদের হাতে কারামত প্রকাশ করেন। এমনকি অলীগণ তা জানতেও পারেন না। পূর্ববর্তী যুগের অনেক সৎ লোক, সাহাবী, তাবেয়ী এবং পরবর্তী যুগের অনেক সৎ লোকের হাতে আল্লাহ্ কারামত প্রকাশ করেছেন। যেমন মারইয়াম (আঃ), আসহাবে কাহাফ, জুরাইজ, আব্বাদ বিন বিশর, উমার বিন খাত্তাব, উসায়েদ ইবনে হুযায়ের এমনি আরও অনেক সাহাবীর হাতে আল্লাহ তাআলা কারামত প্রকাশ করেছেন। যারা কুরআন ও

হাদীছের অনুসরণ করেন, তাদের হাতেই কারামত প্রকাশ হতে পারে। যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীছের অনুসরণ করে না, তার হাতে যদি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে কোন কিছু বের হয়, যেমন আগুনে প্রবেশ করা, শুণ্যে উড়াল দেয়া, সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া ইত্যাদি তাহলে বুঝতে হবে যে এগুলো ধান্দাবাজি, শয়তানি ও ভন্ডামী। তা কখনও কারামত হতে পারে না। কারামত ও ভন্ডামীর মধ্যে পার্থক্য করার জন্য কুরআন ও হাদীছ হচ্ছে একমাত্র মাপকাঠি।

সুফীরা তাদের জীবিত ও মৃতকল্পিত পীর ও অলীদের মর্যাদা বাড়ানোর জন্য তাদের কারামত বর্ণনায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে থাকে। এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, যে সমস্ত কাজ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ করার ক্ষমতা রাখে না কিংবা যেগুলো আল্লাহর সিফাত, তা কখনও অলীদের কারামত হতে পারে না। যেমন মৃতকে জীবিত করা, অলীদের আদেশে নদ-নদী ও আসমান-যমিনের কাজ পরিচালিত হওয়া ইলমে গায়েবের দাবী করা ইত্যাদি। আমরা সুফীদের ধারণায় অলীদের কয়েকটি বানোয়াট কারামতের উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি পরিস্কার করার চেষ্টা করবো।

ক) মৃতকেজীবিত করাঃ

সুফীরা বিশ্বাস করে তাদের অলীরা মৃতকেজীবিত করতে সক্ষম।

চরমোনাই পীরের লেখা ভেদে মারেফত বা ইয়াদে খোদা বইয়ের ১৫ পৃষ্ঠায় মৃতকে জীবিত করার যে গল্পটা আছে তা ন্বিরুপঃ

শামসুদ্দীন তাব্রীজী নামের এক লোক ছিলেন। লোকেরা তাকে পীর সাহেব কেবলা বলত। এবার আসি মূল গল্পে।

একদা হযরত পীর সাহেব কিবলা রোম শহরের দিকে রওয়ানা হইলেন। পথিমধ্যে ঝুপড়ির ভেতর এক অন্ধ বৃদ্ধকে লাশ সামনে নিয়া কাদঁতে দেখিলেন। হুজুর বৃদ্ধকে প্রশ্ন করিলে বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, হুজুর এই পৃথিবীতেআমার খোঁজ-খবর করিবার আর কেউ নাই, একটি পুত্র ছিল সে আমার যথেষ্ট খেদমত করিত, তাহার ইন্তেকালের পর সে একটি নাতি রাখিয়া যায়। সেই ১২ বছরের নাতি একটা গাভী পালিয়া আমাকে দুগ্ধ খাওয়াইত এবং আমার খেদমত করিত, তার লাশ আমার সম্মুখে দেখিতেছেন। এখন উপায় না দেখিয়া কাঁদিতেছি। হুজুর বলিলেন এ ঘটনা কি সত্য? বৃদ্ধ উত্তর করিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তখন হুজুর বলিলেনঃ "হে ছেলে আমার হুকুমে দাঁড়াও"। ছেলেটি উঠে দাঁড়াল এবং দাদুকে জড়াইয়া ধরিল, বৃদ্ধ তাকে জিজ্ঞেস করিল তুমি কিরুপে জিন্দা হইলে। ছেলে জবাব দিল, আল্লাহর অলি আমাকে জিন্দা করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ) তারপর ঐ অঞ্চলের বাদশাহ হুজুরের এই খবর পেয়ে উনাকে তলব করিলেন। উনাকে পরে জিজ্ঞেস করিলেন "আপনি কি বলিয়া ছেলেটিকে জিন্দা করিয়াছেন"। হুজুর বলিলেন আমি বলেছি হে ছেলে আমার আদেশে জিন্দা হইয়া যাও। অতঃপর বাদশাহ বলিলেন, যদি আপনি বলিতেন আল্লাহর আদেশে। হুজুর বলিলেন "মাবুদ! মাবুদের কাছে আবার কি জিজ্ঞেস করিব। তাহার আন্দাজ নাই (নাউ-যুবিল্লাহ)। এই বৃদ্ধের একটি মাত্র পুত্র ছিল তাহাও নিয়াছে, বাকী ছিল এই নাতিটি যে গাভী পালন করিয়া কোনরুপ জিন্দেগী গোজরান করিত, তাহাকেও নিয়া গেল। তাই আমি আল্লাহ পাকের দরবার থেকে জোড়পূর্বক রুহ নিয়ে আসিয়াছি। (নাউ-যুবিল্লাহ)।

এরপর বাদশাহ বলিলেন আপনি শরীয়াত মানেন কিনা? হুজুর বলিলেন নিশ্চয়ই! শরীয়াত না মানিলে রাসূল (সাঃ) এর শাফায়াত পাইব না। বাদশাহ বলিলেন, আপনি শির্ক করিয়াছেন, সেই অপরাধে আপনার শরীরের সমস্ত চামড়া তুলে নেয়া হবে। এই কথা শুনিয়া আল্লাহর কুতুব নিজের হাতের অঙ্গুলি দ্বারা নিজের পায়ের তলা থেকে আরম্ভ করে পুরো শরীরের চামড়া ছাড়িয়ে নিলেন, তা বাদশাহর কাছে ফেলিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেলেন। পরদিন ভোরবেলা যখন সূর্য উঠিল তার চর্মহীন গায়ে তাপ লাগিল তাই তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন হে সূর্য, আমি শরীয়াত মানিয়াছি, আমাকে কষ্ট দিওনা। তখন ওই দেশের জন্য সূর্য অন্ধকার হইয়া গেল। দেশের মধ্যে শোরগোল পড়িয়া গেল। এই অবস্থা দেখিয়া বাদশাহ হুজুরকে খুঁজিতে লাগিলেন।

জঙ্গলে গিয়া হুজুরের কাছে বলিলেনঃ শরীয়াত জারি করিতে গিয়া আমরা কি অন্যায় করিলাম, যাহার জন্য আমাদের উপর এমন মুসিবত আনিয়া দিলেন। তখন হুজুর সূর্য কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেনঃ আমি তোমাকে বলিয়াছি আমাকে কষ্ট দিওনা, কিন্তু দেশবাসীকে কষ্ট দাও কেন? সূর্যকে বশ করা কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব? ইহা বলা মাত্র সূর্য আলোকিত হইয়া গেল। আল্লাহ্ পাক তাহার ওলীর শরীর ভাল করিয়া দিলেন।
প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! চরমোনাই পীর কর্তৃক বর্ণিত উপরোক্ত বানোয়াট কাহিনীতে গভীরভাবে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে এতে একাধিক শির্ক বিদ্যমান। যেমনঃ
১) কুরআন বলছে, জীবিতকে মৃত্যু দেয়া এবং মৃতকে জীবিত করা একমাত্র আল্লাহ্র কাজ। কোন নবী বা অলী মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ
قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
হে নবী! আপনি জিজ্ঞেস করুন, তোমাদেরকে আসমান থেকে ও যমীন থেকে কে রুযী দান করেন? কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সমপাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ! তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছ না? (সূরা ইউনুসঃ ৩১)
এই আয়াত থেকে বুঝা যায় মক্কার মুশরিকরাও এ কথা বিশ্বাস করত না যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ মৃতকে জীবিত বা জীবিতকে মৃত্যুদান করার ক্ষমতা রাখেন না। অথচ চরমোনাইয়ের পীর ও মুরীদগণ তা বিশ্বাস করে থাকেন। আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ
وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
অথচ আল্লাহ্ই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই, তোমরা যা কিছুই কর না কেন, আল্লাহ্ সবকিছুই দেখেন। (সূরা আল-ইমরানঃ ১৫৬) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ
كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
এভাবে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদেরকে তার নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করেন, যাতে তোমরা চিন্তা কর। (সূরা বাকারাঃ ৭৩) আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ
أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে অলী (অভিভাবক ও বন্ধু) স্থির করেছে? উপরন্তু আল্লাহ্ই তো একমাত্র অলী (অভিভাবক ও বন্ধু) । তিনি মৃতদেরকে জীবিত করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (সূরা শূরাঃ ৯) এমনি আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ মৃতকে জীবিত করতে পারে না। এটি একমাত্র আল্লাহর বৈশিষ্ট। এমন কি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য মুজেযা থাকা সত্বেও মৃতকে জীবিত করার মুজেযা তাঁকে দেয়া হয় নি। এটি ছিল একমাত্র ঈসা (আঃ)এর মুজেযা।
এ ব্যাপারে তাদের দাপট দেখে মনে হয় তাদের কল্পিত অলীরা মৃতকে জীবিত করার ক্ষেত্রে ঈসা (আঃ)এর চেয়েও বেশী ক্ষমতা সম্পন্ন। কারণ ঈসা (আঃ) মৃতকে জীবিত করতেন قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ অর্থাৎ তুমি আল্লাহর আদেশে জীবিত হও। যেমন আল্লাহ তাআলা ঈসা (আঃ)কে লক্ষ্য করে বলেনঃ

وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي.
এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাড় করিয়ে দিতে। (সূরা মায়িদাঃ ১১০)
আর চরমোনাই পীর ও মুরীদদের বিশ্বাস হচ্ছে, তাদের অলীগণ قُمْ بِإِذْنِي অর্থাৎ আমার আদেশে উঠে দাঁড়াও এ কথা বলে মৃতকে জীবিত করে থাকেন।
সুতরাং কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, কোন পীর বা অলী মৃতকে জীবিত করতে পারে, তাহলে সে মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে।
২) চন্দ্র-সূর্য, নদ-নদী, দিবা-রাত্রি ইত্যাদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও হুকুমে চলে না। আল্লাহ তআলা বলেনঃ

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

আল্লাহ্, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের ওপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় মোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দুই প্রকার (জোড়ায় জোড়ায়) সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে। (সূরা রাদঃ ২-৩) আল্লাহ তাআলা আরও বলেনঃ

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ্। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? (সূরা আনকাবুতঃ ৬১) আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ্ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তার খবর রাখেন? (সূরা লুকমানঃ ২৯(

খ) সুফীদের অলীগণ মানুষকে পশু বানিয়ে ফেলতে পারেনঃ

এখানে সুফীদের একটি বানোয়াট কারামতের ঘটনা উল্লেখ করা বিশেষ প্রয়োজন মনে করছি। এটি এমন একটি ঘটনা, যা বর্ণনা করেছেন আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শাইখ। আসুন ঘটনাটি শুনি।

শাইখ তার আলোচনায় বলেনঃ পূর্বকালে এমন একজন আলেম ও সৎ লোক ছিলেন, যিনি মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিতেন এবং অসৎ কাজের নিষেধ করতেন। এমনকি তিনি হাঁটে-বাজারে গিয়েও দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখতেন। একবার তিনি বাজারে গিয়ে দেখলেন একজন আতর ব্যবসায়ী মাদক দ্রব্য তথা নেশা জাতীয় বস্তু বিক্রয় করছে। এ দৃশ্য দেখে স্বীয় অভ্যাস মোতাবেক তিনি জোরালো প্রতিবাদ করলেন। তিনি অনবরত প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে থাকলেন। এতে আতর ব্যবসায়ী অসন্তুষ্ট হলো। প্রতিবাদের এক পর্যায়ে উক্ত আলেম ও সৎ লোকটি পশুর ন্যায় জ্ঞানশূণ্য হয়ে গেলো। তাঁর অনুসারী ও ছাত্রগণ তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গেলো। তারা তাদের উস্তাদের বিষয়টি নিয়ে হতাশ হয়ে গেলেন এবং চিকিৎসার ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। চিকিৎসা সম্পর্কে তারা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করা শুরু করলেন। লোকেরা এমন একজনই চিকিৎসকের কথা বললো, যাকে যুল জানাহাইন তথা দুই ডানা ওয়ালা বলে ডাকা হয়। অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস ছিল যুল জানাহাইন দুই প্রকার ইলমের অধিকারী। একটি হচ্ছে শরীয়তের ইলম তথা যাহেরী ইলম আর অপরটি হচ্ছে হাকীকত-মারেফত তথা বাতেনী ইলম।

যাই হোক তাকে সেই যুল জানাহাইনের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ছাত্ররা যুল জানাহাইনের কাছে তাদের উস্তাদের ঘটনা বর্ণনা করার পর সে বললঃ আতর ব্যবসায়ীর (বিক্রয়কারীর) কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তোমাদের উস্তাদের এই অবস্থা হয়েছে। তোমরা কি জান না যে, উক্ত মদ ব্যবসায়ী মানুষের মাঝে বিরাট একজন অলী হিসাবে পরিচিত? এরপর যুল জানাহাইন ছাত্রদেরকে বললঃ তোমরা তাকে ঐ আতর ব্যবসায়ীর (নেশা জাতীয় দ্রব্য বিক্রয়কারীর) কাছে নিয়ে যাও এবং তার কাছে ক্ষমা চাও। এতে তোমাদের উস্তাদ জ্ঞান ফিরে পাবে। তারা তাই করলো। তারা তাঁকে নিয়ে উক্ত আতর বিক্রেতা এবং কল্পিত অলীর কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাদের উস্তাদকে ক্ষমা করে দেয়ার আবেদন করলেন। এতে আতর ব্যবসায়ী অলী

আলেমের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরই ঘুমন্ত মানুষ জাগ্রত হওয়ার ন্যায় উস্তাদ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলেন এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন।
এবার শরীয়তের এই আলেম তাঁর মুসীবতে পড়ার কারণ বুঝতে পারলেন এবং ইলমে মারেফতের গুরুত্বও বুঝতে সক্ষম হলেন। সুতরাং তিনি ঐ আতর ব্যবসায়ী (হাশীশ, মদ, হেরোইন ইত্যাদি) বিক্রয়কারীর কাছে ক্ষমা চাইলেন।
প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! এই ঘটনার বর্ণনাকারী হচ্ছেন মিশরের স্বনাম ধন্য ইসলামী বিদ্যাপীঠ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শাইখ। তিনিও এই ধরণের কল্পিত কাহিনীতে বিশ্বাস করেন এবং মানুষের কাছে তা বর্ণনা করেন। আমাদের দেশের দিকেও যদি আমরা একটু দৃষ্টি দেই তাহলে দেখতে পাব আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও উঁচু মানের মাদরাসাগুলোর প্রফেসর, মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, শিক্ষক, আদালতের বিচারপতি, আইনজীবিসহ সকল পেশার শিক্ষিত লোকেরা পেশাগত দায়িত্ব পালনে খুবই যত্নশীল। তারা যখন ছাত্রদেরকে ক্লাশে পাঠ দান করতে যান তখন তারা প্রতিটি বিষয় পড়াতে গিয়ে ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত রেফারেন্স সরবরাহ করতে সচেষ্ট থাকেন এবং সঠিক ও নির্ভুল তথ্যটিই প্রদান করতে গিয়ে বিষয়বস্তুর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। কোর্টের বিচারপতি ও আইনজীবিগণ আসামীকে অভিযুক্ত করার জন্য একাধিক সাক্ষী ও দলীল প্রমাণ খুঁজতে থাকেন।
কিন্তু যখন তারা কোন পীরের হাতে মুরীদ হতে যান তখন তারা পীরের এমন কারামত ও কাহিনীর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যান এবং চোখ বন্ধ করে তা বিশ্বাস করেন, যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তারা একবারের জন্যও যাচাই-বাছাই করে দেখেন না যে, ইসলামী শরীয়তের সাথে এ বিষয়গুলো সাংঘর্ষিক কি না?
আযহারের শাইখ যে কিচ্ছাটি শুনালেন তাতে দেখা যাচ্ছে শরীয়তের সুস্পষ্ট আদেশ লংঘনকারীও আল্লাহর অলী হতে পারে, শরীয়তের কোন বিধান না মানলেও প্রকৃত পক্ষে তারা আল্লাহর অলী। কেননা তারা তো কারামত দেখাতে পারে। তারা মানুষকে পাগল করে দিতে পারে, মৃতকে জীবিত করতে পারে, বৃষ্টিবর্ষণ করতে পারে এবং নদ-নদীও তাদের আদেশে চলে।
আমরা বলছিঃ এগুলো কারামত নয়। এগুলো হচ্ছে শয়তানীয়াত বা শয়তানের খেলা-তামাশা। এরা আল্লাহর অলী নয়; শয়তানের অলী। এই সমস্ত শয়তানীয়াতে যারা বিশ্বাস করে তাদের জীবদ্দশায় যদি মিথ্যুক ও কানা দাজ্জাল আসে তবে তারা সেই দাজ্জালের কথাও বিশ্বাস করবে। কিয়ামতের আগে দাজ্জাল এসেও অনেক বড় বড় কাজ করে দেখাবে। সে আকাশকে বৃষ্টিবর্ষণের আদেশ দিলে আকাশ বৃষ্টিবর্ষণ করবে, ঐ জমিনকে ফসল উৎপন্ন করতে বললে জমিন তা পালন করবে এবং সে মৃতমানুষকেও জীবিত করে দেখাবে। এগুলো দেখিয়ে সে রুবুবীয়তের দাবীও করবে। সুফীবাদের মাশায়েখরা এভাবে মানুষের জন্য মিথ্যা ও বানোয়াট কারামত বর্ণনা করার মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য দাজ্জালের প্রতি বিশ্বাস করার পথই যে সহজ করে দিচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।
আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের লোকেরা অলীদের কারামতে বিশ্বাসী। স্বাভাবিক ও প্রচলিত রীতির বাইরে যা প্রকাশিত হয় তাই কারামত। তার মাঝে এবং শয়তানীয়াতের মধ্যে পার্থক্য করার মূলনীতি হচ্ছে, আমরা দেখবো যে কার থেকে তা বের হয়েছে? তিনি যদি কুরআন ও সুনাহ-এর অনুসারী মুমিন ব্যক্তি হয়ে থাকেন এবং হারাম ও গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকেন তাহলে আমরা তাঁর কারামতে বিশ্বাস করি। এ ধরণের অনেক কারামত সাহাবী ও সালাফদের থেকে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো আমরা কখন-ই অস্বীকার করি না।
পক্ষান্তরে যারা মদ্যপায়ী, হারাম কাজে সদা মশগুল এবং শরীয়তের উপর আমল করে না, তাদের থেকে চিরাচরিত নিয়মের বাইরে কিছু বের হলে আমরা সেগুলোকে দাজ্জাল ও শয়তানের কাজ বলেই মনে করি। এগুলো ইসলামের পক্ষে নয়; বরং বিপক্ষে এবং ইসলামের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, যে সমস্ত সিফাত (গুণাগুণ ও কর্ম) শুধু আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট তা কখনও অলীদের কারামত হতে পারে না। সুতরাং যে সমস্ত পীর শরীয়তের পুরোপুরি অনুসরণ করে বলে

দাবী করে এবং তাদের মধ্যে ইসলামী আমল ও আদব-আখলাক দেখা যায় তারাও যদি এমন কিছু দাবী করে, যা আল্লাহর গুণাগুণ ও সিফাতের সাথে খাস তাও ভন্ডামী।
আমাদের দেশের দেওয়ানবাগী, ছারছিনা, চরমোনাই, ফুরফুরা শরীফ, তাবলীগ জামাআত এবং অন্যান্য তরীকার পীরদের মাঝে ইসলামী লেবাস পরিলক্ষিত হলেও তাদের বই-পুস্তক ও ভাষণ-বক্তৃতায় এমন অনেক কারামতের বর্ণনা পাওয়া যায়, যা আল্লাহর সিফাতের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং এগুলোও কারামত নয়; বরং শয়তানীয়াত। এ সব থেকে মুসলিমদের সাবধান ও সতর্ক থাকা জরুরী। সঠিক ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনই সকল প্রকার গোমরাহী থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়।

শরীয়ত ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সুফীবাদের মূলনীতিঃ

সকল মাজহাবের লোকগণ ইসলামের মূলনীতি হিসেবে কুরআন ও সুন্নাহকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে থাকেন। কিন্তু সুফীবাদের মূলনীতি সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তাদের মূলনীতির ব্যাপারে যথেষ্ট গড়মিল রয়েছে। কতিপয় সুফীবাদে কুরআন ও হাদীছকে বাদ দিয়ে নিম্নে মূলনীতিগুলোর উপর তারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে থাকেন। আবার কতিপয় সুফী তরীকার লোকেরা কুরআন ও হাদীছের সাথে আরও অনেকগুলো কাল্পনিক মূলনীতি থেকে তথাকথিত আত্মশুদ্ধির জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে থাকে। আসুন আমরা তাদের এ মূলনীতিটি একটু বিস্তারিত আলোচনা করি।

১) কাশ্‌ফঃ

বিভিন্ন দিক নির্দেশনা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সুফীগণের সবচেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য মূলনীতি হচ্ছে কাশফ। সুফীদের বিশ্বাস হচ্ছে আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে একজন সুফী সাধকের হৃদয়ের পর্দা উঠে যায় এবং তাদের সামনে সৃষ্টি জগতের সকল রহস্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাদের পরিভাষায় একেই বলা হয় কাশফ।

وقد عرف أهل التصوف الكشف بأنه: الإطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداً

সুফীগণ কাশফের সংজ্ঞায় বলেছেন, যে পর্দার আড়ালে যে সমস্ত গায়েবী তথ্য ও প্রকৃত বিষয়সমূহ লুকায়িত আছে তা পাওয়া ও দেখার নামই হচ্ছে কাশফ। কাশফ হাসিল হয়ে গেলে আল্লাহ এবং সুফী সাধকের মাঝে কোন অন্তরায় থাকে না। তখন তারা জান্নাত, জাহান্নাম, সাত আসমান, Rwgb, আল্লাহর আরশ, লাওহে মাহফুজ পর্যন্ত ঘুরে আসতে পারেন। তারা গায়েবের সকল খবর, মানুষের অন্তরের অবস্থা এবং সাত আসমানে I জমিনে যা আছে তার সবই জানতে পারেন। এমন কি তাদের অবগতি ব্যতীত গাছের একটি পাতাও ঝড়েনা, এক বিন্দু বৃষ্টিও বর্ষিত হয় না, আসমান-যমীনের কোন কিছুই তাকে অক্ষম করতে পারে না। এমন কি লাওহে মাহফুযে যা আছে তাও তারা অবগত হতে পারেন। এমনি আরও অসংখ্য ক্ষমতা অর্জনের দাবী করে থাকেন, যা একমাত্র মহান আল্লাহর গুণ।

কাশফের একটি উদাহরণঃ

তাবলীগি নেসাব ফাযায়েলে আমাল নামক বইয়ের মধ্যে কাশফ-এর একাধিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পাঠকদের জন্য আমরা এখানে মাত্র একটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

শায়খ আবু ইয়াজিদ কুরতুবী (রঃ) বলেনঃ আমি শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে সে দোযখের আগুন হইতে নাজাত পাইয়া যায়। আমি এই খবর শুনিয়া এক নেছাব অর্থাৎ সত্তর হাজার বার আমার স্ত্রীর জন্য পড়িলাম এবং কয়েক নেছাব আমার নিজের জন্য পড়িয়া আখেরাতের সম্বল করিয়া রাখিলাম। আমাদের নিকট এক যুবক থাকিত। তাহার সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ছিল যে, তাহার কাশ্‌ফ হয় এবং জান্নাত-জাহান্নামও সে দেখিতে পায়। ইহার সত্যতার ব্যাপারে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। একবার সেই যুবক আমাদের সহিত খাওয়া-দাওয়ায় শরীক ছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ সে চিৎকার দিয়া উঠিল এবং তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইল এবং সে বলিলঃ **আমার মা দোযখে জ্বলিতেছে, আমি তাহার অবস্থা দেখিতে পাইয়াছি।** কুরতুবী (রহঃ) বলেনঃ আমি তাহার অস্থির অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন। আমার খেয়াল

হইল যে, একটি নেছাব তাহার মার জন্য বখশিয়া দেই। যাহা দ্বারা তাহার সত্যতার ব্যাপারেও আমার পরীক্ষা হইয়া যাইবে। অর্থাৎ তাহার কাশ্ফ হওয়ার ব্যাপারটাও পরীক্ষা হইয়া যাইবে। সুতরাং আমার জন্য পড়া সত্তর হাজারের নেছাবসমূহ হইতে একটি নেছাব তাহার মার জন্য বখশিয়া দিলাম। আমি আমার অন্তরে ইহা গোপন রাখিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ যুবক তৎক্ষনাৎ বলতে লাগিল চাচা! আমার মা দোযখের আগুন হইতে রক্ষা পাইয়া গিয়াছে।

কুরতুবী (রহঃ) বলেনঃ এই ঘটনা হইতে আমার দুইটি ফায়দা হইল। এক. সত্তর হাজার বার কালেমা তাইয়্যেবা পড়ার বরকত সম্পর্কে যাহা আমি শুনিয়াছি উহার অভিজ্ঞতা। দুই. যুবকটির সত্যতার (তার কাশ্ফ হওয়ার) একীন হইয়া গেল।

দেখুনঃ ফাযায়েলে আমাল, ১ম খন্ড, ১৩৫ পৃ ষ্ঠা প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর-২০০১ ইং। দারুল কিতাব, ৫০ বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত) এমনি আরও অনেক শির্কী ও বিদআতী কথা ফাযায়েলে আমল বইটিতে রয়েছে, যা সচেতন পাঠক একটু খেয়াল করে বইটি পড়লে সহজেই ধরতে পারবেন।

প্রিয় পাঠক ভাই ও বন্ধুগণ! জান্নাত ও জাহান্নামের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতে যতটুকু বলা হয়েছে, তা ব্যতীত অন্য কোন খবর জানার কোন উপায় নেই। কারণ এগুলো গায়েবী বিষয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আমাদেরকে যতটুকু বলেছেন, আমরা শুধু ততটুকুই জানি। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এর অতিরিক্ত কিছু দাবী করে, তাহলে সে মিথ্যাবাদী। তা বিশ্বাস করা সুস্পষ্ট শির্ক। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ্ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধু একজন ভীতি প্রদর্শক ও সু-সংবাদ দাতা ঈমানদারদের জন্য। (সূরা আরাফঃ ১৮৮) আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ.

আপনি বলুনঃ আমি তোমাদেরকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃ শ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ অহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিনঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা কর না? (সূরা আনআমঃ ৫০) আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ.

তিনি অদৃ শ্যেরজ্ঞানী। তিনি অদৃ শ্যবিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত কোন রাসূল ব্যতীত। (সূরা জিনঃ ২৬-২৭) আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ

ثَلَاثٌ مَنْ تَكَلَّمَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قُلْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ قَالَ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ قَالَتْ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُخْبِرُ بِمَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ وَاللَّهُ يَقُولُ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

যে ব্যক্তি বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রবকে চক্ষে দেখেছেন সে আল্লাহর উপর বিরাট মিথ্যাচার করল। যে ব্যক্তি বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ তিনি গোপন করেছেন, সে আল্লাহর উপর বিরাট মিথ্যা রচনা করল। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ হে রসূল! পৌঁছে দিন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে। আর যদি আপনি এরূপ না করেন, তবে আপনি তার পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না। (সূরা মায়িদাঃ ৬৭) আর যে ব্যক্তি বিশ্বাস

করবে যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লাম (গায়েবের) আগাম খবর দিতে পারতেন সেও আল্লাহর উপর চরম মিথ্যা রচনা করল। (তিরমিযী, হাদীছটি সহীহ(

বুখারী শরীফে রবী বিনতে মুআওভিয (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন কতিপয় ছোট মেয়ে দফ তথা একদিকে খোলা ঢোল বাজাচ্ছিল এবং বদরের যুদ্ধে নিহত তাদের পিতাদের বীরত্বগাঁথা বর্ণনা করছিল। মেয়েদের মধ্য হতে একটি মেয়ে বলে ফেললঃ

وَفِينَا نَبِىٌّ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَقُولِى هَكَذَا وَقُولِى مَا كُنْتِ تَقُولِينَ

আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন, যিনি আগামীকালের খবর বলতে পারেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ বালিকার কথার প্রতিবাদ করে বললেনঃ এই কথা অর্থাৎ আমাদের মধ্যে এমন একজন নবী আছেন, যিনি আগামীকালের খবর বলতে পারেন- এটি বাদ দাও। আর বাকী কথাগুলো বলতে থাকো। (সহীহ বুখারী হাদীছ নং- ৪০০১)

এমনি আরও কুরআন অনেক আয়াত ও সহীহ হাদীছের মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া গায়েবের খবর আর কেউ জানে না।

২) নবী ও মৃ তঅলী-আওলীয়াগণঃ সুফীদের আরও কথা হচ্ছে, তারা আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে জাগ্রত অবস্থায় সরাসরি মিলিত হয়ে থাকেন। শুধু তাই নয় তারা অন্যান্য নবীদের রুহের সাথেও সাক্ষাত করেন ও তাদের আওয়াজ শুনেন এবং বিভিন্ন দিক নির্দেশনা লাভ করেন। মৃ ত অলী-আওলীয়া, ফেরেশতাদের সাথেও তারা সাক্ষাত করেন এবং তাদের থেকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

৩) খিজির আলাইহিস সালামঃ

সুফীদের মধ্যে খিযির (আঃ)এর ব্যাপারে অনেক কাল্পনিক ঘটনা প্রচলিত রয়েছে। তাঁর সাথে সাক্ষাতের বিষয়েও অসংখ্য কাহিনী বর্ণিত রয়েছে। তাদের ধারণা খিজির (আঃ) এখনও জিবীত আছেন। তিনি যিকির ও দ্বিনী মাহফিলে হাজির হন। সুফীরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁর কাছ থেকে দ্বিনী বিষয়ের জ্ঞান, শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও যিকির-আযকার শিক্ষা করেন। তাদের এ কথাটি বানোয়াট। কোন মৃ তব্যক্তির সাথে জীবিত মানুষের কথা বলার ধারণা একটি কুফরী বিশ্বাস।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শেষ জীবণে একদা আমাদেরকে নিয়ে ইশার নামায আদায় করলেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেনঃ

أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ

আজকের রাত্রির গুরুত্ব সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণা আছে কি? আজকের এই রাত্রিতে যারা জীবিত আছে, আজ থেকে শুরু করে একশত বছর পর পৃ থিবীতেতাদের কেউ আর জীবিত থাকবেনা। (বুখারী হাদীছ নং- ১১৬)

এই হাদীছ থেকে জানা গেল যে, খিযির (আঃ)ও ইন্তেকাল করেছেন। তিনি কিয়ামতের পূর্বে কারও সাথে সাক্ষাত করবেন না।

৪) ইলহামঃ

আল্লাহর পক্ষ হতে মুমিন ব্যক্তির অন্তরে যে ইলম পতিত হয়, তাকে ইলহাম বলে। এভাবে প্রাপ্ত অন্তরের ইলহাম অনুযায়ী মুমিন ব্যক্তি কাজ করতে পারে বা সিদ্বান্ত নিতে পারে। তবে তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু সুফীরা তাদের কল্পিত অলীদের কল্পিত ইলহামকে শরীয়তের একটি বিরাট দলীল মনে করে এবং সুফীবাদের ভক্তরা তা পালন করা আবশ্যক মনে করে। তারা মনে করে অলীরা সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে ইলহাম প্রাপ্ত হন। এ জন্য সুফীরা অলীদের স্তরকে নবুওয়তের স্তরকে উত্তম মনে করে থাকে। কেননা নবীরা দ্বীনের ইলম গ্রহণ করতেন ফেরেশতার মাধ্যমে আর অলীরা গ্রহণ করেন সরাসরি বিনা মধ্যস্থতায় আল্লাহর নিকট থেকে।

৫) ফিরাসাতঃ

ফিরাসাত অর্থ হচ্ছে অন্তদৃষ্টি। সুফী সাধকরা দাবী করে যে, অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে তারা মানুষের অন্তরের গোপন অবস্থা ও খবরাদি বলে দিতে পারেন। অথচ কুরআন ও হাদীছের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় অন্তরের খবর আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

চোখের চুরি এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন। (সূরা গাফেরঃ ১৯)

৬) হাওয়াতেফঃ

সুফীদের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে হাতাফ। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ্ তাআলা, ফেরেশতা, জিন, অলী, এবং খিযির (আঃ)এর কথা সরাসরি অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে শুনতে পায় বলে দাবী করে থাকে।

৭) সুফীদের মিরাজঃ

সুফীরা মনে করে অলীদের রূহ উর্ধ্ব জগতে আরোহন করে, সেখানে ঘুরে বেড়ায় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জ্ঞান ও রহস্য নিয়ে আসতে পারে।

৮) স্বপ্নের মাধ্যমে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তিঃ

স্বপ্ন হচ্ছে সুফীদের অন্যতম একটি নির্ভরযোগ্য মূলনীতি। তারা ধারণা করে স্বপ্নের মাধ্যমে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে কিংবা তাদের কোন মৃত বা জীবিত অলী ও শায়েখের কাছ থেকে শরীয়তের হুকুম-আহকাম প্রাপ্ত হওয়ার ধারণা করে থাকে। স্বপ্নের ব্যাপারে সঠিক কথা হচ্ছে, নবীগণের স্বপ্নই কেবল অহী এবং তার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিধান অনুসরণযোগ্য। কিন্তু সাধারণ মুমিনদের স্বপ্নের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, তা দ্বারা শরীয়তের কোন বিধান সাব্যস্ত হবে না।

৯) মৃতকল্পিত অলী-আওলীয়াদের সাথে সুফীদের যোগাযোগঃ

বর্তমান চরমোনাই পীরের পিতা মৃত মাওলানা ইসহাক তার ভেদে মারেফত বইয়ে লিখেছেনঃ হযরত থানবী লিখিয়াছেন, জনৈক দরবেশ সাহেবের মৃত্যুর পর এক কাফন চোর কবর খুড়িয়া দরবেশের কাফন খুলিতে লাগিল। দরবেশ সাহেব চোরের হাত ধরিয়া বসিলেন। তা দেখে চোর ভয়ের চোটে চিৎকার মারিয়া বেহুঁশ হইয়া মরিয়া গেল। দরবেশ তার এক খলীফাকে আদেশ করিলেন চোরকে তার পার্শ্বে দাফন করিতে। খলীফা এতে আপত্তি করিলে দরবেশ বলিলেনঃ কাফন চোরের হাত আমার হাতের সঙ্গে লাগিয়াছে, এখন কেয়ামত দিবসে ওকে ছাড়িয়া আমি কেমনে পুলছেরাত পার হইয়া যাইব? (ভেদে মারেফতঃ ২৭-২৮ পৃঃ)

১০) শয়তানঃ

সুফীদের কিছু বিরাট এক দলের লেখনী থেকে জানা যায় যে, তারা শয়তানের কাছ থেকেও বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা পেয়ে থাকেন। তাবলিগী নিসাব ফাযায়েলে আমাল বইয়ে হজরত জুনাইদ (রঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি একবার শয়তানকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষের সামনে উলঙ্গ হইয়া থাকিতে তোর কি লজ্জা হয় না? শয়তান বলিল, ইহারা কি মানুষ? মানুষ তো উহারা, যাহারা শোনিযিয়ার মসজিদে বসা আছেন। যাহারা আমার শরীরকে দুর্বল করিয়াছি, আমার কলিজাকে পুড়িয়া কাবাব করিয়া দিয়াছে। হজরত জুনাইদ (রহঃ) বলেন, আমি শোনিজিয়ার মসজিদে গিয়া দেখিলাম কয়েকজন বুযুর্গ হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া মোরাকাবায় মশগুল রহিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, খবীস শয়তানের কথায় কখনও ধোকায় পড়িও না।

মাসূহী (রহঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তিনি শয়তানকে উলঙ্গ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষের মধ্যে এইভাবে উলঙ্গ হইয়া চলাফেরা করিতে তোর লজ্জা হয় না? সে বলিতে লাগিল, খোদার কসম, ইহারা তো মানুষ নয়। যদি মানুষ হইত তবে ইহাদের সহিত আমি এমনভাবে খেলা করিতাম না, যেমন বাচ্চারা ফুটবল নিয়া খেলা করে। মানুষ ঐ সমস্ত লোক, যাহারা আমাকে অসুস্থ করিয়া দিয়াছে। এই কথা বলিয়া সে সুফিয়ায়ে কেরামের জামাতের দিকে ইশারা করিল।

)দেখুনঃ ফাযায়েলে আমাল, দ্বিতীয় খন্ড, ৩৭৬-৩৭৭ পৃ ষ্ঠা দারুল কিতাব, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে ২০০১ সালে প্রথম প্রকাশিত)

ইহা জানা কথা যে শয়তান হচ্ছে মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু। সে সর্বদা মানুষকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করে গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে আল্লাহর সাথে এ ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ করেছে। তার কথা আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মযীদে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেনঃ

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

সে বললঃ আপনি আমাকে যেমন উদ্‌ভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বামদিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (সূরা আরাফঃ ১৬-১৭) এতে সহজেই বুঝা যায় একজন মানুষ কি কতটুকু মূর্খ এবং অজ্ঞ হলে ইবলীসকে সঠিক দিক নির্দেশক ও পরামর্শ দাতা হিসেবে বিশ্বাস করতে পারে। অথচ আমার তাবলীগ জামাতের ভাইগণ আল্লাহ্ দ্রোহী পাপিষ্ঠ ইবলীস শয়তানকেও তাদের গুরু মনে করে থাকেন। ফাযায়েলে আমাল বইয়ের এ জাতীয় বানোয়াট কাহিনীগুলো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার পরও কি তারা বইটির পক্ষে উকালতি করবেন? বানোয়াট কিচ্ছা-কাহিনীতে ভরপুর এই বইটি বাদ দিয়ে কুরআন ও হাদীছের নির্ভেজাল ইসলামের দিকে ফিরে আসার সময় কি এখনও হয় নি?

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলতে চাই যে, বর্তমানে মুসলিমরা যে সমস্যার সম্মুখীন তার অন্যতম কারণ হচ্ছে সুফীবাদের বিভ্রান্তি। এই পঁচা মতবাদের কারণেই মুসলিম জাতি দুনিয়ার বুকে তাদের মর্যাদা হারিয়েছে। সুবিশাল উছমানী খেলাফতের সুলতানগণ ইসলামের সঠিক আকীদাহ থেকে সরে গিয়ে যখন সুফীবাদের বেড়াজালে আটকে পড়েন তখন থেকে তাদের শক্তিতে ভাটা পড়তে থাকে। এক পর্যায়ে উছমানী সম্রাজ্যের ভিত্তি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পতনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে।

তাই আজ মুসলিমদের হারানো শক্তি ও মর্যাদা ফেরত পেতে চাইলে খোলাফায়ে রাশেদার যুগের ন্যায় নির্ভেজাল তাওহীদের দিকে ফেরত আসতে হবে। অন্যথায় তারা দ্বীন ও দুনিয়ার উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করার চেষ্টা করে কখনই সাফল্য লাভ করতে পারবে না।

আল্লাহ্ তাআলার কাছে দুআ করি তিনি যেন পথহারা এই জাতিকে সুফীবাদসহ সকল বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করেন এবং নির্ভেজাল তাওহীদের দিকে ফেরত আসার তাওফীক দেন।